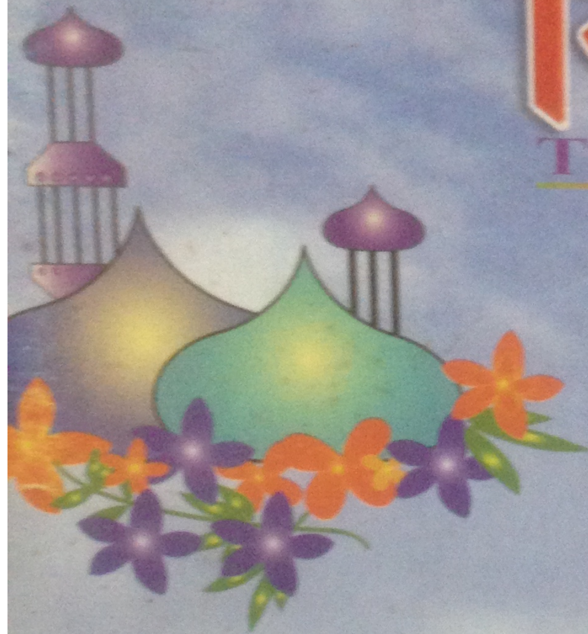
য় দিবস ও ঈদ সংখ্যা

মাসিক

নিয়মের মধ্যে অনিয়মের বিরুদ্ধে

সিমিলিয়া

THE MONTHLY SIMILIA





এইডস-অবধারিত অপমৃত্যুর নাম

বাংলাদেশ বিজয় দিবস আসল বিজয় কতদূর ...

মাসিক সিমিলিয়া ❑ বর্ষ ১ ❑ সংখ্যা ১ ❑ ডিসেম্বর ২০০৬ ❑ ডিক্লারেশন নং ১৪১/০৬ ❑ অগ্রাহায়ণ-পৌষ ১৪১৩ বাংলা ❑ মূল্য ৮. ১৫

মাসিক নিয়মের মধ্যে অনিয়মের বিরুদ্ধে
সিমিলিয়া
THE MONTHLY SIMILIA

সম্পাদকের কথা

শুভেচ্ছা

প্রিয় পাঠক, শুভেচ্ছা নিবেন। নতুন বছর আমাদের জন্য সফলতার হয় এ প্রত্যাশা সকলের। নতুন বছরের প্রথম দিন মুসলিম জাতির দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব 'ঈদুল-আজহা'। সবাইকে ঈদ মোবারক। তাকওয়াশীলতার মাধ্যমে কোরবানীর ঈদ পালন যেন পথ চলায় সকলের জন্য মঙ্গলের হয় এমনটি আমাদের কামনা। বিজয়ের মাস শেষে নতুন করে পথ চলা শুরু। বাংলাদেশের এ বিজয় মাসে আপনাদের জন্য আরেকটি সুখবর, সংবাদপত্রের জগতে 'মাসিক সিমিলিয়া'র আত্মপ্রকাশ। অনেকটা পথ পেরিয়ে অবশেষে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম আপনাদের পত্রিকা। নতুন চলায় ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। কথা থাকলো ভুল সংশোধন করে শুদ্ধতায় যাবো। আর তাই আপনাদের পরামর্শ আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমরা সচেষ্ট থাকবো আপনাদের পছন্দের মত করে অজানা জগৎকে জানার জন্য, যা কিছু সুন্দর তার সব কিছু দিয়ে অন্ধকার মাড়িয়ে আলোর পথে যাবার। নিয়মিত প্রকাশনার অঙ্গীকার নিয়ে আমাদের যাত্রায় আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা সিমিলিয়া'র জন্য অপরিহার্য।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আসন্ন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৭ জানুয়ারীর ২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। অনেক বাঁধা বিপত্তি পেরিয়ে সকল দলের অংশগ্রহন নিশ্চয়তায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরলস চেষ্টার পর বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতি যে অশনি সংকেত ছিল তা কেটে গেছে। জনগণ এখন স্বস্তি পেয়েছে। জীবন যাত্রার স্থিতীশীলতা ফিরে পেয়েছে। আশংকা এখন সামনে। নির্বাচন কতটা নিরপেক্ষ, অবাধ এবং সকল দলের কাছে এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। আমাদের রাজনীতির সংস্কৃতি নির্বাচনের পরাজয় মেনে নেয়াটা এখনো আসেনি। কোন দল আশা অনুযায়ী ফল লাভ না করলে নির্বাচনে প্রশ্নবিদ্ধ করে অভিযোগ তোলে এবং জয়ী দলকে অভিনন্দন না করে বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তখন জনগণ আবার রাজনৈতিক প্রতিকুল পরিবেশের স্বীকার হয়। দিন যত যায় গণতন্ত্র তত পরিপক্ক হওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের দেশে তার উল্টো। গণতন্ত্র ক্রমান্বয়ে বিপন্ন হয়। এ অবস্থার থেকে সাধারণ জনগণ মুক্তি চায়। রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতিতে আরো উদার মনোভাব নিয়ে দেশ ও জনগণের দিকে তাকিয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহনশীল হয়ে, কাউকে প্রতিপক্ষ না ভেবে যে কোন দলের কল্যাণকর কর্মসূচি দাবিকে সংসদে আলোচনা করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান উপহার দিবেন। জনগণকে অবরুদ্ধ না করে সংসদ যেন সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু হয়। আসন্ন নির্বাচনে দায়িত্বে নিয়োজিত প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী অর্পিত দায়িত্ব নৈতিকতার আলোকে নিরপেক্ষভাবে পালন করে দেশে এবং বিদেশে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। আমাদের গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো ফলাফল মেনে নিবেন। আমরা আর অতীতে যেতে চাই না। সমৃদ্ধির বাংলাদেশ দেখতে চাই। দেখতে চাই সকলে মিলে দেশ গড়ার কাফেলায়। আসুন সকলে মিলে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নবম সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে উন্নয়নের বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করি।

সূচী

সম্পাদক ঃ ডাঃ শেখ ফরিদ আহাম্মদ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ মোঃ আলী আক্কাস মিঝি

সম্পাদকীয় কার্যালয় ঃ
২৫ জয়কালী মন্দির রোড (২য় তলা), ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৬৬৭৮৩৬, ০১১৯১৯৫৭৮৭, ০১৭১৫-২০০৩৩৯
ই-মেইল ঃ similiabd@gmail.com

কাজী মোঃ মাহবুব কর্তৃক ২৫, জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
মির্জা অফসেট প্রিন্টার্স, ৮ জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ কথা

বাংলাদেশ বিজয় দিবস আসল বিজয় কত দূর ...

বাংলাদেশীরা মহা আনন্দে, মহা আড়ম্বরে ঘরে বাহিরে উদ্‌যাপন করলো ১৬ ডিসেম্বর। পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে ১৯৫২-৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন আপামর জনগণ আন্দোলন করে স্বাধীন 'বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র তৈরী করলো। বিনিময়ে আমরা হারিয়েছি লাখ লাখ স্বদেশী। তাদের রক্ত, ইজ্জত সবকিছু উৎসর্গের পিছনে শুধু ভূখন্ডগত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রই ছিল না। তাদের স্বপ্ন ছিলো প্রতিটি নাগরিক তার মৌলিক অধিকার সহ নৈতিকতা ভিত্তিক নিজ সংস্কৃতির লালন সহ সাধারন সুখ সমৃদ্ধির স্থিতিশীল রাষ্ট্র। হালের বাংলাদেশে উৎসর্গকৃত মানুষগুলোর স্বপ্ন কেবলি কল্পনা ছাড়া বাস্তবতা কেবলি তিমিরে। অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে বাংলাদেশীরা রাত জেগে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন করলো। আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধাঞ্জলির মাধ্যমে জাতি আমাদের বীরদের স্মরণ করেন। ধাপে ধাপে রাষ্ট্রের সকল দল (বিএনপি, আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য দল) বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ জনগণ স্মৃতিসৌধে ভীড় জমান। অসংখ্য মানুষের পদভাবে সাভার স্মৃতিসৌধ এলাকায় হিমসীম পোহাতে হয় নিরাপত্তা বাহিনীকে। রাস্তায় দীর্ঘ যানজট। সবকিছুকে অতিক্রম করে সাধারণ জনগণ একটু সময়ের জন্য হলেও ভুলে যায় সকল যন্ত্রণা। দেখে মনেই হবে না এ জাতি রাজনৈতিক দলগুলোর অস্থিতিশীল পরিবেশে নবম সংসদ নির্বাচনের দিকে হাঁটছে। তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। অথচ এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছে না। আমাদের রাজনৈতিক কর্তারা। দেশও জনগণের কল্যাণের চেয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার কৌশল নিয়ে সার্বক্ষনিক ব্যস্ত থাকেন তারা। রাষ্ট্র ও জনগণকে নিয়ে সদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। আর তাই ক্ষমতার পট, পরিবর্তনের সাথে সাথে সবকিছুতেই ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। যা কখনো কোন রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন আনতে পারে না। আয়তনের চেয়ে জনসংখ্যা বেশীর দেশ বাংলাদেশে অপুষ্টি, অশিক্ষা, দারিদ্র নৈতিকতা বিবর্জিত সংস্কৃতি, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সতীনের ঘর সদৃশ আচরণ তখন আমাদের বিজয় দিবস আক্ষরিক নাকি দার্শনিক এ প্রশ্ন স্মৃতিসৌধ থেকে ফিরে আসা কিংবা অন্য উদযাপন থেকে ফিরা প্রতিটি নাগরিকের। রাষ্ট্রের প্রতিটি সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র, টেলিভিশন চ্যানেলে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান। এর থেকে আমরা জাতি কি শিখতে পারছি? দিন যতই যাচ্ছে আমরা ততই সংকটের মুখে পতিত হচ্ছি। আমরা সভ্যতার আচরণ ভুলে যাচ্ছি। যার উদাহরণ ৩০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে শিক্ষিত সন্ত্রাসীর ছত্রছায়ায় মূর্খ সন্ত্রাসীর নগ্ন হামলা। রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে বাংলাদেশীদের বিভক্ত করছে রাজনৈতিক দলগুলো। অথচ জ্ঞানীরা বলছেন ঐক্যবদ্ধ জাতী ছাড়া রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে আমরা কোথায় যাচ্ছি? ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে রাজধানী সহ বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল বেশ সাজসজ্জার মাধ্যমে পালনের দৃশ্য লক্ষনীয়। রাস্তার উপর বড় বড় তোরণ, বড় বড় বিল্ডিংগুলোতে রঙিন সাজসজ্জা। শিশুরা মনের আনন্দে রাত জেগে জাতীয় পতাকা বাড়ীর ছাদে, গলি, মহল্লায় মহল্লায়, রাস্তার পাশে রশিতে লাগিয়ে, বেশ আনন্দ করছে, কোথাও কোথাও মাইক বাজানো হচ্ছে এ দৃশ্য সর্বত্র। এ শিশুরা জানেনা এদের অগ্রজরা তাদের জন্য শিক্ষনীয় কোন রাজনৈতিক আদর্শ দিতে পারছেন না। পারছেন না কোন সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের নিশ্চয়তা। এমনি করে বিজয় দিবস আসে আর যায় প্রশ্ন থেকেই যায় আসল বিজয় কতদূর... ।



❖ এন সিকদার

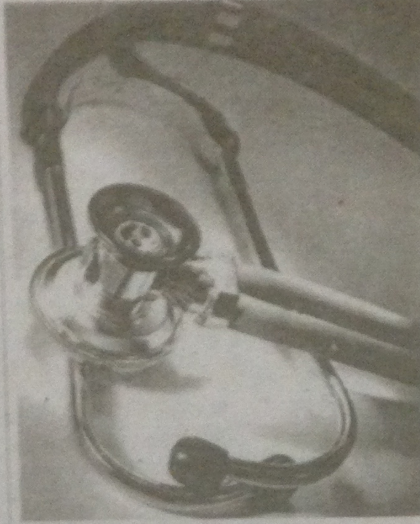
অবহেলিতদের কথা



পল্লী চিকিৎসকদের প্রতি রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি অপরিহার্য

ডাঃ শেখ ফরিদ আহাম্মদ

আমাদের পল্লীর ভৌতিক অবকাঠামো কিছুটা পরিবর্তন হলেও অধিকাংশে এখনো তিমিরে। জীবন যাত্রার মান চোখে পড়ার মত নয়। যদিও স্বাধীনতার তিন দশক পেরিয়ে চার দশকের দ্বারপ্রান্তে। কবে আমাদের পল্লী অঞ্চলের পরিবর্তন হবে সে প্রশ্নের উত্তর অজানা। পল্লী অঞ্চলের সহজ সরল জীবন যাপন পদ্ধতি এখনো শহরের চেয়ে মানসিকতার দিক দিয়ে অনেক উন্নত। যদিও এরা শহর কেন্দ্রিক কোন সুযোগ সুবিধাকে স্পর্শ করতে পারেনা। সারাদিন পরিশ্রম করে সন্ধ্যার পরেই নেমে আসে নির্বাক জনপদ। কোন সারাশব্দ নেই। যদিও কোথাও কোথাও কেরোসিন তেলের বাতি জ্বলছে। রাতের আঁধারে ছুটে বেড়াচ্ছে খালি পেয়ে স্বজনের আর্তনাদে ঘরে বসা বড় দায়। কারো জ্বর, কারো ব্যথা, কারোবা প্রসব ব্যথা। কোথায় পাবে চিকিৎসক, কোথায় পাবে টাকা কিংবা কোথায় পাবে যানবাহন সবই কেমন হতাশায় ঘেরা। ঠিকানা একটাই পাশের বাড়ীর পল্লী ডাক্তার। আমাদের সংবিধানে সংরক্ষিত পাঁচটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি হলো রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। স্বাধীনতার এত বছর পরও এর কোন সুরাহা হয়নি। সরকার প্রতি বছর যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিন্তু চোখে পড়ার মত কোন পরিবর্তন হয়নি। যা কিছু হচ্ছে সবই শহর কেন্দ্রিক। পল্লী কেবলি প্রহসনের শিকার, বৈষম্যের শিকার। পাশ করা চিকিৎসকরা কেহই আমরা পল্লী কেন্দ্রিক থাকতে চায় না। রাষ্ট্রীয়ভাবে চাকুরীর ব্যবস্থা করা হলেও সেখানে যেতে চায় না। কিংবা থাকলে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য কোনটাই যথাযথভাবে পালন করে না। মাস শেষে শুধু বেতন ভোগ করে। আর লাকটি প্রাইভেট চেম্বারে নিয়োজিত রাখা। এমনি অবস্থায় রাখে আল্লা মারে কে। পল্লীর সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলো পল্লী চিকিৎসক দিয়ে তাদের সকল চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। এ সামাজিক চিকিৎসকরা যা বুঝেন তা



করেন। না বুঝলে শহরে পাঠিয়ে দেন। যেভাবে পারে অর্থ ব্যবস্থা করে শহর মুখী চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। কেউবা মুক্তি পান আবার কেউবা বিফল হন। আমাদের বেড়ে ওঠা একজন পল্লী চিকিৎসক দিয়ে আবার যবনিকাপতের সময় একজন পল্লী চিকিৎসকই থাকেন পাশে। এহেন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে পল্লী চিকিৎসকদের জন্য কিছু সুযোগ/সুবিধা কিংবা তাদেরকে চিকিৎসা পেশায় সমকালীন ধ্যান ধারনার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য, তাদেরকে একটি নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় দৃষ্টি অপরিহার্য্য। পল্লী চিকিৎসকদেরকে উপজেলা/থানা মেডিক্যাল অফিসারের মাধ্যমে প্রতি মাসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এতে করে ভুল চিকিৎসা থেকে রোগীরা যেমন রেহাই পাবেন, তেমনি করে রোগী চিকিৎসায় তাদের সীমাবদ্ধতা জেনে পাশ করা চিকিৎসকদের কিংবা হাসপাতালে শরনাপন্ন হওয়ার উপদেশ দিতে পারবেন। এর ফলে পল্লী চিকিৎসকদের মধ্যে চিকিৎসার সঠিক ধারা সম্পর্কে ধারনা হবে। যারা বর্তমানে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত তাদেরকে উপজেলা/থানা মেডিক্যাল অফিসারের নিবন্ধনকৃত হয়ে চিকিৎসা করার ছাড়পত্র দেওয়া যেতে পারে। নতুন করে কেহ পল্লী চিকিৎসক হতে হলে ন্যূনতম এসএসসি পাশ তৎসহ ছয়মাসের পল্লী প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করার বিধান করা। কেননা আমরা প্রায়ই দেখে থাকি পল্লী চিকিৎসকরা ঔষধের সঠিক উচ্চারণ যেমন করতে পারেন না তেমনি ঔষধের নাম বাংলা/ইংরেজীতে শুদ্ধ করে লিখতে পারেন না। এটা একটা বিরাট সমস্যা। পল্লী চিকিৎসকদেরকে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। তারাই জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে বিরাট ভূমিকা রাখে। তাদের ভূমিকাকে যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি সুফল পাবেন। আর রাষ্ট্র তার জনগণকে কোনভাবে উপেক্ষা করতে পারেন না। জনগণকে নিয়েই রাষ্ট্র উন্নয়নের দিকে ধাবিত হবে। এমন প্রত্যাশা সকলের। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার প্রতিটি জনপদে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারছেন না ততক্ষন পর্যন্ত পল্লী চিকিৎসকদের আপগ্রেড করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যা যা করার তাই করবেন এবং উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দিবেন। এমন প্রত্যাশা নিভৃত পল্লীর কান্নারত স্বজনের, রোগার্ত মানুষের।

প্রচ্ছদ কথা

কুরবানীর তাৎপর্য ও ফজীলত

ইবনে আব্বাস আলী

ঈদুল আজহা অর্থ-কুরবানীর ঈদ-উৎসব। এদিন ঈদের নামাযের পর পশু কুরবানী করে মহান আল্লাহর ওয়াজিব হুকুম পালনের মাধ্যমে উক্ত ঈদ পালন করা হয় বলে একে ঈদুল আজহা বা কুরবানীর ঈদ বলে।

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। পৃথিবীর সূচনাকাল হতে প্রত্যেক যুগেই কুরবানীর প্রচলন ছিল। তবে বর্তমানে প্রচলিত কুরবানীর সূচনা হয় মুসলিম মিল্লাতের জনক হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে।

কুরবনী কি ?

'কুরবানী শব্দটি মূলতঃ আরবী কুরব বা কুরবান হতে উৎগত। এর অর্থ- নৈকট্য, সান্নিধ্য, উৎসর্গ, ত্যাগস্বীকার, আত্মদান ইত্যাদি।

হযরত যাঈদ বিন আরকাম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে, একদা কতক সাহাবী নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! কুরবানী কী ? প্রতিউত্তরে নবী করীম (সাঃ) বললেন- কুরবানী তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। পুনঃ প্রশ্ন করা হল-এতে আমাদের জন্য কী ফজীলত রয়েছে ? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন-"কুরবানীর পশুর প্রতিটি পশমের পরিবর্তে একটি করে নেকী প্রদান করা হবে।" (মিশকাত শরীফ)

মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রাণপ্রিয় একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈলকে কুরবানীতে পেশ করে মানব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আল্লাহ তা'আলা উক্ত কুরবানীকে কবুল করে ইসমাঈলের পরিবর্তে বেহেশতী দুম্বা কুরবানীর ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে মহান আল্লাহ এই কুরবানীকে ধনী (নিসাবের মালিক) লোকদের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

কুরবানীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মহান কুরবানীর ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এভাবে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কোন সন্তান-সন্তুতি ছিল না। তিনি বৃদ্ধ বয়সে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন-হে আমার প্রভূ! আমাকে একটি নেককার পুত্র দান করুন। মহান আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করে একটি নেককার পুত্র দান করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার আদুরে সন্তানের নাম রাখলেন 'ইসমাঈল'।

ক্রমান্বয়ে ছেলেটি বড় হতে লাগল। যখন ইসমাঈল তের বছর বয়সে উপনীত হয়ে পিতার সাথে চলাফেরা করতে পারেন এবং বিপদে-আপদে পিতার সাহায্য করতে পারেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন তাঁকে আল্লাহর রাহে কুরবানী করতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানকে বললেন-"হে আমার প্রিয় বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি-তোমাকে জবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কী?"

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নবীগণের স্বপ্ন ওহীস্বরূপ। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে গেল যে, এটা মহান আল্লাহর আদেশ। তাই তিনি উত্তরে বললেন-"হে আমার মুহতারাম পিতা! আপনি আদেশপ্রাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলুন। ইনশাল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।"

পিতা-পুত্র মহান আল্লাহর আদেশ পালনার্থে সন্তুষ্টচিত্তে মিনা প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন। যাওয়ার সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় আস্তিনে লুকিয়ে রশি ও ছুরি নিয়ে নিলেন।

পথিমধ্যে শয়তান হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে প্রতারিত করতে সচেষ্ট হলে, প্রতিবারই হযরত ইবরাহীম (আঃ) কংকর মেরে শয়তানকে বিতাড়িত করে দেন। এ কাজটি আল্লাহর নিকট পছন্দ হওয়ায় তিনি পবিত্র হজ্বে আমলটি সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। তাই অদ্যাবধি এ বিধানটি মিনা ময়দানে তিনি স্তম্ভে কংকর মারার মাধ্যমে পালিত হয়।

পিতা-পুত্র মিনায় পৌছার পর হযরত ইসমাঈল (আঃ) বললেন-হে আমার পিতা! আমাকে খুব শক্তভাবে বেঁধে নিন; যাতে আমি ছটফট করতে না পারি, আর আপনার পরিধেয় গুটিয়ে নিন যাতে তাতে রক্ত না লাগে, অন্যথায় আমার ছাওয়াব হ্রাস পেতে পারে এবং আমার জননী তা দেখে অতি ব্যাকুল হয়ে যাবেন। আর আব্বাজান! আপনার ছুরি শানিত করে নিন এবং আমার গলায় দ্রুত চালাবেন, যাতে আমার প্রানবায়ু অতিদ্রুত বের হয়ে যায়। কেননা, মৃত্যু অতি কঠিন বিষয়। আর আম্মাজানকে আমার সালাম দিবেন। সম্ভব হলে, আপনার সাথে আমার জামা নিয়ে যাবেন। হয়তো তা দেখে আমার জননী একটু সান্ত্বনা পাবেন।

এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে চুমু খেলেন এবং বললেন- তুমি এ কাজে আমার বড়ই সহায়তাকারী। অতঃপর তাকে জমিনে কাত করে শুইয়ে দিলেন। তারপর তাঁর গলায় দ্রুত ছুরি চালালেন।

কিন্তু বহু চেষ্টা করেও গলা কাটতে পারলেন না। তখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছুরির নীচে শায়িতাবস্থায় বলতে লাগলেন-হে আব্বাজান! আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিন; তাহলে অতিদ্রুত আমাকে জবেহ করতে পারবেন। আমার চেহারা দেখে আপনার মায়া হয়; যার দরুণ আমাকে জবেহ করতে পারছেন না। তাছাড়া আমিও আপনার ছুরি দেখে ঘাবড়ে যাই।

একথা শুনে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় ছেলেকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে তার গলায় দ্রুত ছুরি চালালেন। এমনি মুহূর্তে অদৃশ্য হতে আওয়াজ এলো- "হে ইবরাহীম (আঃ)! আপনি স্বীয় রবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।" (সূরাহ সাফফাত)

আওয়াজ শুনে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পাশে তাকিয়ে দেখেন-হযরত জিবরাঈল (আঃ) একটি জান্নাতী দুম্বা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর আদেশে ঐ দুম্বাটিকে জবেহ করলেন।

মহান আল্লাহর নিকট তাদের পিতা-পুত্রের এই সীমাহীন আত্মত্যাগ পছন্দ হওয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত তিনি উম্মেতে মুসলিমার সকল সামর্থবান নারী-পুরুষের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

কুরবানীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

কুরবানীর উদ্দেশ্য হচ্ছে-তাক্বওয়া ও আল্লাহর রিজামন্দী অর্জন করা। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- "আল্লাহর নিকট কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত পৌছে না, তার কাছে পৌছে শুধু তোমাদের তাক্বওয়া।" (সূরাহ হজ্ব, ৩৭ আয়াত) এছাড়াও কুরবানীর লক্ষ্য হল- নিজের মনের খাহিশাত নফসের চাহিদাকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করে নিজেকে দ্বীনের জন্য নিবেদন করা এবং প্রতিটি কাজে ইখলাস অবলম্বন তথা তা একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য করা। এ ক্ষেত্রে গোশত খাওয়া কুরবানীর উদ্দেশ্য নয়, বরং পশু জবেহ করার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালন করাই উদ্দেশ্য। আর গোশত হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য উপহার স্বরূপ।

কুরবানীর ফজীলত :

কুরবানীর ফজীলত সম্পর্কে রাসূল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন- "কুরবানীর দিন কুরবানী অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন আমল আল্লাহর নিকট নেই। নিশ্চয়ই কুরবানীর পশুর রক্ত জমিনে পৌছার পূর্বেই এই কুরবানী আল্লাহর নিকট পৌছে যায়। তাই তোমরা অতি সুখী মনে ও আন্তরিকতার সাথে কুরবানী করো।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

এ ছাড়াও কুরবানীর পশুর প্রতিটি লোমের বিনিময়ে একটি করে নেকী হবে বলে হাদীস শরীফের উদ্ধতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি আরো বহু হাদীসে কুরবানীর অসংখ্য ফজীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

Heart Disease

উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে কী খাবেন

উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও ব্রেইনস্ট্রোকের রোগীদের সর্বদা কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন-

ক) সাধারণ নির্দেশাবলী

চিকিৎসকের পরামর্শ মত নিয়ম মাফিক ওষুধ সেবন করুন।

* ধূমপান (সিগারেট, বিড়ি, তামাক) মদ্যপান, জর্দা, সাদাপাতা ইত্যাদি পরিহার করুন।
* মানসিক দুশ্চিন্তা চাপ ও রাগ পরিহার করুন।
* ডাক্তারের নির্দেশমতো হালকা ব্যায়াম হাঁটার অভ্যাস করুন। যোগ ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তুলুন।
* উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
* বাত জ্বর ও বাত জ্বর জনিত হৃদরোগ প্রতিরোধ করুন।
* জন্মগত হৃদরোগের সুচিকিৎসা ও প্রয়োজনে সঠিক সময়ে অপারেশন করান।
* নিয়মিত মেডিক্যাল চেকআপ করে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।
* নিয়মিত জীবন যাপন ও ধর্মীয় আচরণবিধি মানসিক প্রশান্তির আনয়ন করে।

খ) খাদ্য পরিকল্পনা নীতি

রক্তের কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, যার জন্য ক্যালরী পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। প্রাণীজ (মাছ ব্যতীত) প্রোটিনে সম্পৃক্ত চর্বি (স্যাচুরেটেড ফ্যাট) বেশি থাকে। এর পরিবর্তে উদ্ভিজ প্রোটিন বেশি করে খেতে হবে। অসম্পৃক্ত চর্বি (আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট) ও উদ্ভিজ তেল প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে খেতে হবে। সহজ আকারের শর্করার পরিবর্তে জটিল শর্করা জাতীয় খাদ্য খাওয়া ভাল। এর জন্য আঁশ জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে হবে।

১। যেসব খাবার বাদ দিতে হবে (কোলেস্টেরল বা সম্পৃক্ত চর্বি সমৃদ্ধ খাবার) ঃ

* ডিমের কুসুম (ডিমের সাদা অংশ খাওয়া যাবে)
* চর্বিযুক্ত মাংস (খাসি, গরু, দুম্বা, শুকর)
* কলিজা * মগজ * গলদা চিংড়ি
* ঘন দুধ, দুধের সর এবং দুগ্ধজাতীয় খাবার যেমন- ঘি, মাখন, ডালডা, মার্জারিন, কেক, পেস্ট্রি, পায়েস
* স্ন্যাকস, সমুচা, পেটিস, চপ, কোল্ড ড্রিঙ্কস (কোক, পেপসি ইত্যাদি)
* মাছের ডিম * নারিকেল
* আলগা (কাঁচা) লবণ এবং লবণ দিয়ে সংরক্ষিত খাবার যেমন- চানাচুর, নোনতা বিস্কুট, নোনা মাছ, আচার, চিপস ইত্যাদি উপরোক্ত খাদ্য দিয়ে তৈরি খাবার

২। আঁশ জাতীয় খাদ্য বেশি করে খেতে হবে

* ডাল, সব রকমের বিশেষত ছোলার ডাল, বুট (দুপুর ও রাতে বেশি করে ডাল খেতে হবে)
* শাক, সব রকমের বিশেষতঃ পুঁইশাক
* সবজি, বিশেষতঃ খোসাসহ সবজি, যেমন- ঢেঁড়স, বরবটি, সিম, কচুর লতি ইত্যাদি
* টক জাতীয় ফল, বিশেষতঃ খোসাসহ ফল, যেমন- পেয়ারা, জাম্বুরা, আমলকি ইত্যাদি

রসুন প্রতিদিন খাওয়া ভাল

* মেথির গুড়া বা ইসবগুলোর ভূষি তিনবেলা খাবার আগে খাওয়া ভাল (৩ চা চামচ ইসবগুলের ভূষি প্রতিবেলায়)

৩। কোলেস্টেরল মুক্ত বা অসম্পৃক্ত চর্বি সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খেতে হবে

* সব রকমের মাছ ও মাছের তেল বিশেষতঃ সামুদ্রিক মাছ, ইলিশ মাছ ইত্যাদি
* উদ্ভিজ তেল, যেমন কর্ন অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি (ক্যালরি ঠিক রেখে খেতে হবে)

৪। হিসাব করে খেতে হবে (ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে গাইড বইয়ের নির্দেশ/চার্ট অনুযায়ী খেতে হবে)

* শর্করা প্রধান খাবারঃ ভাত, রুটি (ময়দা ও সাদা আটার চেয়ে লাল আটা ভাল), আলু, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

চিনি-মিষ্টি দিয়ে তৈরি খাবার।

* মিষ্টি ফল, যেমন- পাকা আম, পাকা কলা, পাকা পেঁপে ইত্যাদি
* দুধ ও দুধের তৈরি খাবার * হাঁস-মুরগির মাংস।

-- ডাঃ প্রশান্ত ঘোষ অপু

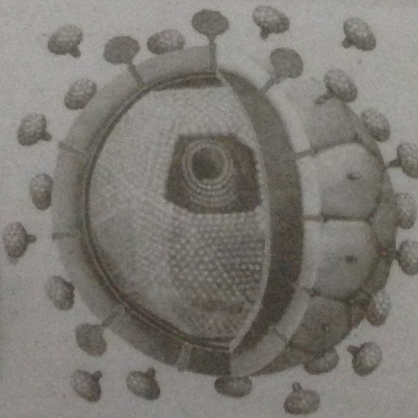
প্রচ্ছদ কথা

সচেতনতাই অপমৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে

এইডস অবধারিত অপমৃত্যুর নাম

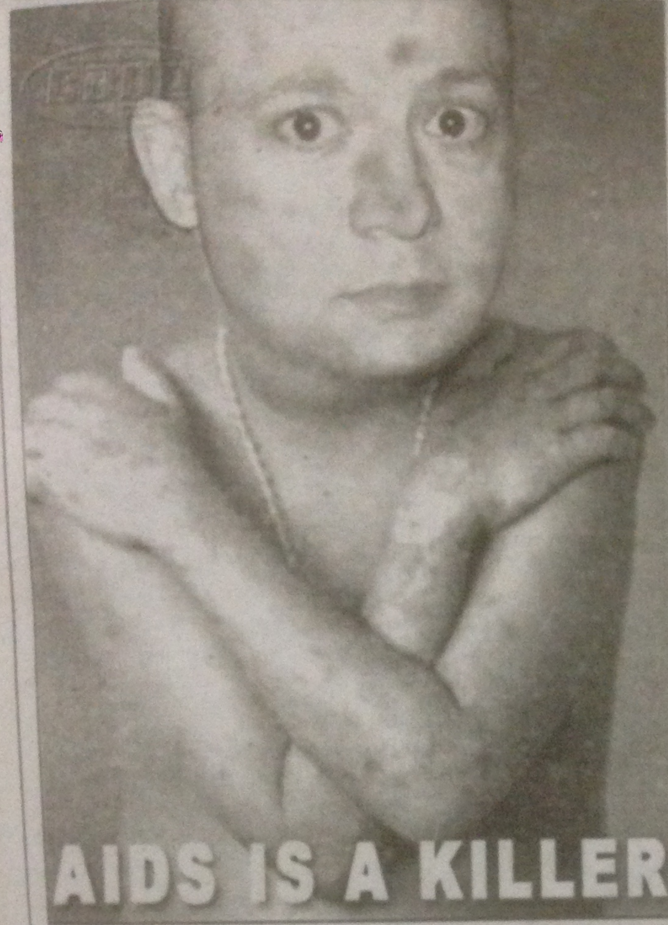


কুলসুম আহাম্মদ ॥ জীবন মানে মৃত্যু। এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে। কেউ স্বাভাবিক ভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, কেউ অস্বাভাবিক ভাবে বিদায় নেন। স্বাভাবিক নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। যত প্রশ্ন অস্বাভাবিক বিদায় নেওয়াকে নিয়ে। আমাদের জীবন যাত্রায় শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া ব্যহত হলে যে অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হয় তা আমাদের কাছে অসুস্থ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। অসুস্থ্য অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক দিক নির্দেশনা কখনো কখনো কোন ক্ষেত্রে অসহায় করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন ব্যবস্থা নেই। আর তখনি বেশী বেশী সচেতনতার কথা বলা হয়। বিশ্ব ব্যাপি তেমনি একটি অসুখের নাম এইডস (AIDS- ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME)। এইডস রোগটি এক ধরনের ভাইরাস দায়ী। তার নাম এইচ আইভি (HIV)। এ ভাইরাস শরীরে ঢুকে ধীরে ধীরে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢেলে দেয়। এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে এইডস- এর লক্ষনাবলী প্রকাশ পেতে বেশ সময় লাগে। বিশ্বে প্রথম মার্কিন বিজ্ঞানীরা এক কৃষ্ণাঙ্গের দেহে ১৯৮১ সালে প্রথম এইচ আইভি (HIV) ভাইরাস সনাক্ত করেন। দিনের পর দিন রোগটি বিশ্বে ভয়াবহ হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। গবেষণার পর গবেষণা চলছে। এখন পর্যন্ত কোন কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা আবিস্কার করা সম্ভব হয়নি। শুধু লক্ষণাবলীর উপর নির্ভর প্রচলিত মেডিসিন ও আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা চলছে। পাশাপাশি এ রোগের বিস্তার রোধ করতে বিশ্বব্যাপি চলছে সচেতনতা। বিজ্ঞানীরা এ রোগের বিস্তারে কারণ ও কারা ঝুকিপূর্ণ এবং কিভাবে রোগমুক্ত থাকা যায় তার সর্বশেষ গবেষণা দিয়ে মানুষকে জানাচ্ছেন। মানুষের ভেতর সচেতনতা বৃদ্ধি করা লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতিবছর ১ ডিসেম্বরকে 'বিশ্ব এইডস দিবস' ঘোষণা করেছেন। সে মোতাবেক এ দিনটি মহা আয়োজনের মাধ্যমে পালন করা হয়। ২০০৬'র বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "জবাবদিহিতা (ACCOUNTABILITY) এবং মূল স্লোগান ছিল" "এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার (Stop AIDS, keep the promise)" এ পর্যন্ত কয়েক কোটি মানুষ এইডস রোগে মারা গেছেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইউএন এইডস-এর ২০০৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে প্রায় ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ লোক এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত এর মধ্যে ১ কোটি ৭৩ লক্ষ মহিলা যার ১ কোটি ৩২ লক্ষই সাব-সাহারান আফ্রিকার অধিবাসী। এ পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক এইডস-এ মৃত্যুবরণ করেছে। এশিয়া অঞ্চলে আনুমানিক ৮৩ লক্ষ লোক এইচআইভি সংক্রমন নিয়ে বসবাস করছে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার শিশু। বিশ্ব এবং এশিয়ার মধ্যে ভারত এইচআইভি সংক্রমিত জনবহুল দেশ। সর্বশেষ আনুমানিক ৫৭ লক্ষ লোক ভারতে এইচআইভি সংক্রমিত বলে জানা গেছে। আগামীতে সংক্রমনের হার বাড়লে আড়াই কোটিতে পৌছবে এর মধ্যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্বে এবং এশিয়ায সবচেয়ে ভাল অবস্থানে। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম এইডস রোগী পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সরকারী হিসাব অনুযায়ী সর্বশেষ তথ্যে দেখা যায়, দেশে ৭ হাজার ৬৭৭ জন এইচআইভি ভাইরাস বহন করছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৭৬ জন মারা গেছে। বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমনের হার অনেক কম। আশংকার কথা হলো সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ কম ঝুঁকিপূর্ন দেশ হলেও সংক্রমণের জন্য যে সকল পরিবেশ দরকার তার সব কিছুই বাংলাদেশে বিদ্যমান।



বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমনের উল্লেখযোগ্য কারণ সমূহ-

দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা, যৌন ব্যবসা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষের যোগসূত্র, শ্রমিক অভিবাসন, জেন্ডার বৈষম্য, দারিদ্র, শিক্ষার অনগ্রসরতা,যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নেশার আধিক্য, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অপ্রতুল সেবা, এইডস/এইচআইভি সম্পর্কে সচেতনার অভাব। সর্বোপরী ধর্মীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। বিশ্বব্যাপী সচেতনার মুলে এখন স্ব স্ব ধর্মীয় অনুশাসনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ধর্মীয় কাজের মাধ্যমে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করলে শুধু এইডস



কেন? হাজারো সমস্যা থেকে মানুষ মুক্ত থাকতে পারবে।

আসুন, জেনে নেওয়া যাক এইডস রোগ বিস্তারের কারণ ও কারা ঝুঁকিপুর্ণ ঃ-

১। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীরা।
২। বিপুল সংখ্যক মানুষ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন পেশায় জড়িত। যেমন- পুরুষ ও মহিলা যৌনকর্মী, যৌনকর্মীর খদ্দের, পুরুষ সমকামী, হিজড়া, ট্রাক চালক, গামেন্টসকর্মী।
৩। বস্তি এলাকায় নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা।
৪। পেশাদার রক্তদাতা এবং রক্তগ্রহীতা।
৫। গর্ভস্থ শিশু
৬। ডিউটিরত নার্স, ডাক্তার, ব্লাডব্যাংক, কর্মচারী,
৭। ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার না করা।
৮। কম বয়সীদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ বেড়ে যাচ্ছে। তাই তারা ঝুঁকির দিকটা সম্পর্কে সচেতন না এবং প্রতিরোধ সম্পর্কেও ধারনা নেই।
৯। দেশের বাহিরে পাচারকৃত মহিলাদের পতিতালয়ে বিক্রি করা হয়। তাদের অনেকেই দেশে ফিরে এইডস রোগের বিস্তার ঘটায়।
১০। ধর্ম অনুযায়ী জীবন যাপন না করা।

যেভাবে এইচআইভি সংক্রমিত হয়না-

১। কীটপতঙ্গ বা প্রানীর কামড়ে।
২। আক্রান্ত ব্যক্তিকে ছোঁয়া, করমর্দন ও কোলাকুলি মাধ্যমে।
৩। আক্রান্ত ব্যক্তির খাওয়া খাদ্য খেলে।
৪। একই টয়লেট ব্যবহার করলে।

বিস্তার রোধের উপায়-

১। পরিপূর্ন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চল্য।
২। বৈবাহিক সম্পর্কের বাহিরে যৌন সম্পর্ক না করা।
৩। পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখা এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা
৪। নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করা
৫। নিরাপদ রক্তসঞ্চালন করা এর জন্য নৈতিকতা সম্পন্ন লোক দ্বারা রক্ত সঞ্চালন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
৬। কার্যরত অবস্থায় নার্স, ডাক্তারগণ গ্লাভস ব্যবহার করা (যেখানে প্রয়োজন)
৭। বিদেশ থেকে আসা লোকদের স্ক্রিনিং পদ্ধতি কার্যকর করা।
৮। ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।
৯। সচেতনতার জন্য তরুন সমাজকে কাজে লাগানো।
১০। প্রিন্টিং এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সচেতনতার কার্যক্রম বেশী বেশী করে চালানো।
১১। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ও ঈমামদের যথাযথ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সচেতন কাযক্রম জোরদার করা।
১২। জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তৃনমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সচেতন কার্যক্রমে অংশগ্রহন করা ও জনগনকে সচেতন কার্যক্রমে অংশগ্রহনের উৎসাহ দিয়ে ঘরে ঘরে মুক্তি বার্তা পৌছে দেওয়া।
১৩। মাতা পিতারা তাদের সন্তানকে ছোট বেলা থেকে ধর্মীয়ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের পথ চলার উপর নজর রাখা।

মতামত কথা

ডাক দিয়ে যাই নতুন মতে

প্রফেসর বদরুল আলম
এমবিবিএস, ডিপিএইচ, এলএলবি।

আপনাকে ধন্যবাদ যে, আপনি আপনার রোগের চিকিৎসার জন্য হোমিওপ্যাথিকে বেছে নিয়েছেন। জেনে রাখুন, রোগ আপনার জীবনের স্বাধীনতা হরণ করেছে। আপনার জীবনরাজ্য দেহ, মন, রোগশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আপনার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আপনাকে রক্ষা করতে পারছে না। আপনি এখন বহিঃসাহায্য প্রার্থী। আপনার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুর কাছে আছে বিভিন্ন ধরনের ওষুধশক্তি। এ সব যেন স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে পেট্রিয়ট মিসাইল। সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করতে পারলে এরা রোগশক্তিকে সহজেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।



হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অনুরাগী চিকিৎসক ও মানব কল্যাণী স্বেচ্ছাসেবকগণ এ সব ওষুধ সঠিক মাত্রায় সেবন করে কৃত্রিমভাবে নিজেরা অসুস্থ হয়ে যে সব রোগচিত্র তুলে ধরেছেন সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্য খুঁজে নিয়ে সে রোগটার জন্য অতিসামান্য মাত্রায় ওষুধ ব্যবহার করা হয়- তাতে রোগটা আরোগ্য হয়ে যায়। সাধারণ কথায়, কৃত্রিম রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে বলেই ওষুধটা রোগ আরোগ্য করে। এটা এক নতুন ধরনের ভ্যাকসিন। এতে রোগটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার আগে তাকে দমিয়ে দিয়ে রোগ সমস্যার মোকাবেলা করে।

রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটা এক বিপ্লবী চিন্তাধারা। অন্যান্য চিকিৎসায় ওষুধ প্রয়োগের ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, ফলে একটা রোগ ভাল হয় বটে, কিন্তু আর একটা রোগ দেখা দেয়। আর এ ব্যবস্থায় এটা হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্ট রোগ। চিকিৎসার নামে ওষুধের মাধ্যমে নতুন রোগের সৃষ্টি। হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতির চিকিৎসা এ ধরনের রোগ সৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বলেই এটা আদর্শ চিকিৎসার দাবীদার। এটা আপনাকে সুঁইয়ের খোঁচা দেয় না। ছুরি দিয়ে কাটে না, শুধু ঔষধ খাওয়ায়। শিশুদের কাছে এর চিনিবড়ি ওষুধ খুবই লোভনীয়। ইদানিং কালে বড়িগুলোকে পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পানি ওষুধের তেজ দেখে অনেক তাজ্জব হয়ে যায়। পানিতে গিলতে অসুবিধা হলে বা অজ্ঞান অবস্থায় রোগীকে ঘ্রাণেও এ ওষুধ দেওয়া যায়।

জেনে রাখুন, স্বাস্থ্য হচ্ছে আপনার জন্য বিধাতার পরম আশীর্বাদ এবং আপনার জীবনের সহগ অবস্থা। ইবলিস শয়তানটার মত রোগশত্রু আপনার চারপাশের পরিবেশে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আপনার ভিতরের পরিবেশে আপনার মন আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আপনার অজান্তে এ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছে। যে কোন কারণে রোগ শত্রুটা এদের উপর হামলা করে তাদেরকে কাবু করে ফেলেছে, আপনার জীবনরাজ্যের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা। আপনার আহারে রুচি নেই, পানিও গিলতে পারেন না। পায়খানায়, প্রস্রাবে, ঘুমে দেখা দিয়েছে অনিয়ম। শরীরের এখানে ওখানে ব্যথা, রক্তে জমে উঠেছে শর্করা, রক্তকণিকা গেছে মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে। শরীরে দেখা দিয়েছে অর্বুদ বা পাথর, এক কথায় জীবন নদীটা তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই জীবনের স্বাভাবিক গতিটা হয়ে গেছে অস্বাভাবিক। অর্বুদ বা পাথর কেউ আপনার শরীরে ঢুকিয়ে দেয়নি। জীবন অর্থনীতিতে এ সব বিশৃঙ্খলাজনিত কারণে জেগে উঠা পাহাড়ের চুড়াটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, রোগের পাহাড়টা আরোও বড় এবং সময় মত জীবন রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এটা কিন্তু বরফের পাহাড়ের মত, জীবন রাজ্যের প্রবাহিত তরলগুলো তাদের স্বাভাবিক স্রোত হারিয়ে ফেলে দৃশ্যমান রোগের বরফের রূপ নিয়েছে। সঠিক ওষুধের তেজে এরা গলে যায়, জীবন নদীতে নাব্যতা ফিরে আসে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান রোগের এ হিমশৈল তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

আপনি এখন আপনার বিশেষ চিকিৎসক বন্ধুর কাছে হাজির হয়েছেন, তিনি তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা মত তাঁর ভাণ্ডারে রক্ষিত ওষুধশক্তি দিয়ে রোগ শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য আগ্রহী।

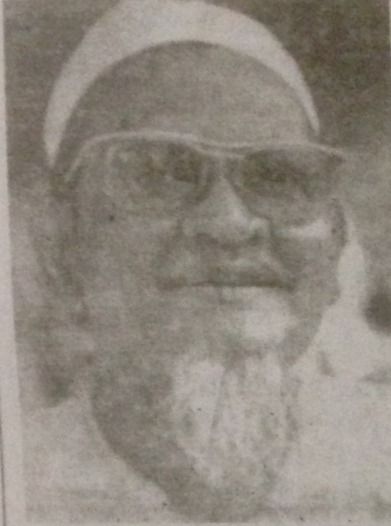
রোগের অনুসন্ধানটা একটা আয়াসসাধ্য কাজ। রক্ত, মল, মূত্র, মাংসে পরীক্ষা, বিভিন্ন অঙ্গের প্রতিচ্ছবি, এসবের পরেও আপনার কাছে অসাচ্ছন্দ্য বোধ হচ্ছে। একজন হোমিওপ্যাথ তার মধ্যে আপনার রোগের প্রতিচ্ছবি খুজতে চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে শরীর যন্ত্রটার চাইতেও বড় হয়ে দেখা দেয় রোগীর যন্ত্রণার উপলব্ধিটা। রোগীর চিকিৎসা তাঁর কাছে শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞান নয়, এটা একটা কলাকৌশলও বটে, এর অবস্থান হচ্ছে ধারণার রাজ্য। রোগীর রোগযন্ত্রণা দূর করাই তাঁর চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য।

আপনার সুচিকিৎসার সাহায্যের জন্য আপনার চিকিৎসককে রোগের পূর্ণ বিবরণ দিন। আপনার একান্ত ব্যক্তিগত কথাগুলোও তাঁর কাছে গোপনীয় থাকবে। অতীতের কোন শারীরিক বা মানসিক আঘাত, কোন রোগ, বিশেষ করে চর্ম রোগের এবং প্রস্রাবের অসুবিধার জন্য চিকিৎসা নিয়ে থাকলে তার উল্লেখ করুন। আপনার রোগকষ্ট কখন বাড়ে, কখন কমে, আহারের কারণে অনাহারে, সকালে, বিকালে, রাত্রে, সপ্তাহে, মাসে, ঋতু বা আবহাওয়ার সাথে রোগের সম্পর্ক থাকলে উল্লেখ করুন, দীর্ঘদিনের রোগ ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করুন। পূর্ব পুরুষের রোগের কথাও জানান।

অনুরোধ রইলো, নিজের রোগের জন্য একটা পঞ্জিকা বা ডায়েরি তৈরী করুন, এতে রোগের গতি হ্রাস, বৃদ্ধি পুরনো ভুলে যাওয়া লক্ষণগুলো সব তুলে ধরুন। পরবর্তী সাক্ষাৎকারে চিকিৎসককে দেখান, আপনার রোগযন্ত্রণার লাঘব, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার উন্নতি আপনার চিকিৎসককে জানান। আপনার জীবনরাজ্যে রোগশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি তাঁর ওষুধের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে আগ্রহী। এজন্য পারতপক্ষে, অন্য কোন ওষুধের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ধূমপান ও অন্যান্য কুঅভ্যাস থেকে বিরত থাকুন। স্বাস্থ্য বিধি ও চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলুন। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনায়।

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম

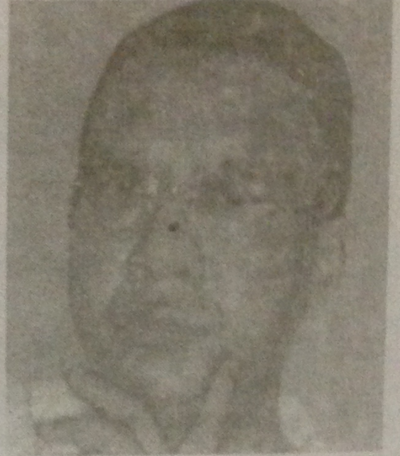
(১৯৩৫-২০০৬)



সিমিলিয়া ডেস্ক ঃ বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর পীর সাহেব চরমোনাইর মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করীম আমাদের মাঝে আর নেই। স্মরণীয় বরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব, ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম এ মহান আলেম ২৫ নভেম্বর ২০০৬ইং সালের নিজ বাড়ীতে ৯.৪০ টায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭১ বছর। বেশ কয়েক বছর যাবৎ তিনি কিডনী রোগে ভূগছিলেন। এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও ওয়াজ মাহফিল ছাড়া তেমন কিছুতে অংশগ্রহন করতেন না এবং কোথাও যাতায়াত করতেন না। এ মহান ব্যক্তিকে হারিয়ে দেশ একজন ইসলামী আন্দোলনের পুরোদা হারালেন। বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

চরমোনাইর পীর সাহেব সৈয়দ মুহাম্মদ করিম ১৯৩৫ সালে বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাইতে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা মাওলানা সৈয়দ ইছহাক (রাঃ) ছিলেন চরমোনাই দরবার শরীফের প্রতিষ্ঠাতা। তার পাঁচ পুত্রের মধ্যে সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করিম ছিলেন মেজ। পিতার কাছ থেকে মাওলানা ফজলুল করীম সাহেব খেলাফত লাভ করেন। নিজ গ্রামের চরমোনাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনারপর চরমোনাই আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাযিল (ডিগ্রি) পাশ করে ১৯৫৭ সালে ঢাকার লালবাগ জামেয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস পাশ করেন। নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত চরমোনাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ইসলামী সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র জীবনেই পিতার সাথে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯৭৩ সালে পিতার ইন্তেকালের পর তিনি আমিরুল মুজাহিদীনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৭ সালে দেশের আলেম সমাজকে নিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আমীর ছিলেন। রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মানুষকে ধর্মীয় পথের সঠিক অনুসারী করার জন্য ওয়াজ-মাহফিল করে সারা জীবন শেষ করেন। রাজনীতি জীবনে দেশের বাহিরে অনেক দেশ সফর করেন। আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনা করি। তার অনুসারীরা নতুন আমীরের নির্দেশনায় পীর সাহেবের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবেন এবং সংগঠনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে সকল ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়োজিত সংগঠনের সাথে মিলে মিশে কাজ করবেন এ প্রত্যাশা সকল মুসলমানের।

মোহাম্মদ হানিফ (১৯৪৪-২০০৬)



সিমিলিয়া ডেস্ক ঃ- জীবন যাত্রায় একজন সফল মানুষ। ঢাকার নির্বাচিত প্রথম মেয়র, ঢাকাবাসীর তথা বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ হানিফ। ১৯৬৫-২০০৬ সালে পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত ঘটনাবহুল রাজনীতির প্রতিটি অধ্যায়ে সম্পৃক্ত এ মানুষটি ২৭.১১.২০০৬ইং তারিখে আমাদের মাঝ থেকে চির বিদায় নেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৬২ বছর। তিনি ১ ছেলে, ২ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাংখী রেখে গেছেন। দেশের প্রবীন জনপ্রিয় এ রাজনীতিবিদের মৃত্যুতে দলমত নির্বিশেষে প্রেসিডেন্টসহ উপদেষ্টামন্ডলী সহ সকল রাজনৈতিক সংগঠন এবং নেতা নেত্রীরা শোক প্রকাশ করেছেন। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী মোহাম্মদ হানিফ ১৯৪৪ সালের ১ এপ্রিল পুরানো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মৃত আবদুল আজিজ। মা মুন্নী বেগম। ১৯৬৭ সালে ঢাকার প্রখ্যাত পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি মাজেদ সর্দারের মেয়ে ফাতেমা বেগমের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা মহানগীর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯৯২ সালেও দ্বিতীয় বারের মত ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৪ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে প্রত্যক্ষ ভোটে বিপুল ভোটের ব্যবধানে মেয়র নির্বাচিত হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। দীর্ঘ সাড়ে আট বছর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে 'জনতার মঞ্চ' গঠন করে রাজনীতিতে তার গ্রহনযোগ্যতাকে আরো গভীরে নিয়ে যান। 'জনতার মঞ্চ' তৎকালীন রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলন। তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের কারনে জনতার মঞ্চ আন্দোলনের সফলতা এসেছে। আওয়ামী কর্মীরা তখন ভুলে গেছে সকল কোন্দল তারই ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন। এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মোহাম্মদ হানিফের শূণ্যতা বেশ ভালোভাবে উপলব্ধী করতে পারছেন। ২০০৩ সালে আবার তৃতীয় বারের মত আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগীরর সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ পদে ছিলেন। আমরা রাজনীতিতে তার আদর্শ অনুসরনের আশা করি।

অধিকারের কথা

শিশুর জন্ম নিবন্ধন জরুরী



আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। আগামী দিনে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে আজকের শিশু। শিশুর প্রতি তাই আমাদের সকলের দায়িত্ব তাকে সঠিকভাবে বড় করে তোলা,সুশিক্ষা দান করা, ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ তৈরী করা ও তার অধিকারগুলো শিক্ষা দেওয়া। আমাদের মৌলিক অধিকারগুলোর মত একটি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করন। জন্ম নিবন্ধন করা শিশুর জন্মগত অধিকার। শিশুর জন্মের পরই তার জন্ম নিবন্ধন করে "জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র" সংগ্রহ করা পরিবারের প্রধান দায়িত্ব। দুঃখের বিষয় এদেশের শতকরা ৭০ ভাগ জনগণই জন্ম নিবন্ধন করা সম্পর্কে অবগত নয়। বর্তমানে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করানোর জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারনা চলছে। এ বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় প্রতিনিধিকে সম্পৃক্ত করে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী নেওয়ার পাশাপাশি মিডিয়া আরো ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সরকারী খাতায় শিশুর নাম নিবন্ধন করা নাগরিকের প্রথম অধিকার বললে ভুল হবে না। পরবর্তীতে শিশুটি বড় হলে এ 'নিবন্ধন সনদ' তার সকল কাজে আসবে। সঠিক বয়স নির্ণয়ের জন্য এ নিবন্ধন অতীব জরুরী। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা কিংবা সিটি কর্পোরেশনে যোগাযোগ করে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা যায়। আসুন সকলে সকলকে সহযোগীতা করে কিংবা সচেতন করে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করনে এগিয়ে আসি। - ফাতেমা জান্নাত

কমলনগরবাসীর প্রত্যাশা

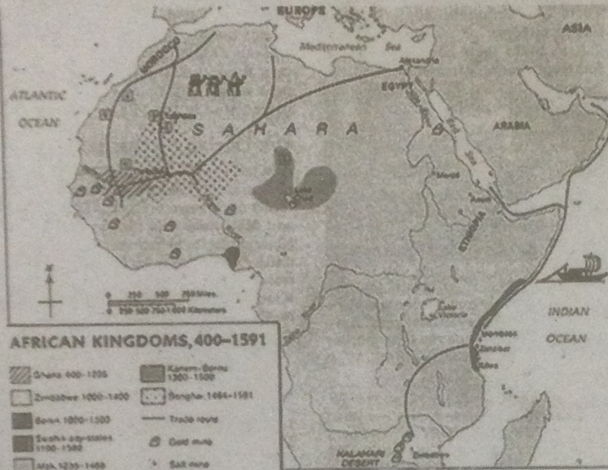
কমলনগর/লক্ষীপুর সংবাদদাতা ঃ লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত সাবেক রামগতি থানা/উপজেলাকে দ্বিখন্ডিত করে হালে নতুন উপজেলা "কমলনগর" করা হয়েছে। ২০০৬ সালের একনেক সভায় অনুমতি প্রাপ্ত হলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৬ সালের শেষের দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন 'কমলনগর উপজেলা'। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ডাক নামে উপজেলার নতুন নামকরন করা হয়। মেঘনার ভাঙ্গনে রামগতি ছোট হয়ে আসলেও এর ভাঙ্গন প্রতিরোধে জনগণের দাবির প্রেক্ষাপটে এ পর্যন্ত কোন সরকার বা মাননীয় সংসদ সদস্যরা কার্যকর দুরদৃষ্টি সম্পন্ন কোন ভূমিকা নেননি। মেঘনার ভাঙ্গনের ফলে শেষ পর্যন্ত সেবাগ্রাম এলাকার মুল সড়ক নদীতে বিলীন হয়ে যায়। যোগাযোগ হয়ে উঠে অসহনীয়। রাজনৈতিক নেতারা এব্যাপারে ততটা সোচ্চার নয়। যতটা সোচ্চার নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের। রামগতির উন্নয়নে সব সময় দক্ষিণের তুলনায় উত্তরের অবস্থান নিম্নে। প্রশাসনিক কর্মকান্ড এবং রাজনৈতিক কর্মকান্ড দক্ষিণে সোচ্চার বিধায় উত্তরের লোকেরা নানা বৈষম্যের ও হয়রানির শিকার হচ্ছে দীর্ঘদিন যাবত। সুপ্ত ক্ষোভ অবশেষে বিকশিত হলে আন্দোলন হয় নতুন উপজেলার। অষ্টম সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্য উত্তর অঞ্চলের জনগণের দাবীর প্রতি সমর্থন করে নতুন উপজেলার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং সফল হন। তুলনামূলকভাবে অন্য সব এমপিদের চেয়ে উত্তর অঞ্চলে উন্নয়নের কাজে জনাব নিজান যথেষ্টই এগিয়ে। বর্তমান কমলনগর উপজেলা ও রামগতি উপজেলা মিলে আসন একটা। আসন্ন নবম সংসদ নির্বাচনে কমলনগর উপজেলার জনগন তাই এবার নির্বাচনে এমন প্রার্থীকে ভোট দিতে আগ্রহী, যার দ্বারা কমলনগর উপজেলার ব্যাপাক উন্নয়ন হয়। বিশেষ করে চিকিৎসা, শিক্ষা, ভৈতিক অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সহ নদী ভাঙ্গন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ এবং শান্তি শৃংখলা রক্ষায় ভূমিকা নিবেন এমন প্রার্থীকে ভোট দিতে আগ্রহী।
সাধারন মানুষের প্রতিক্রিয়ায় এমনটি খুব জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। তারা আরো বলেন আমরা আর বৈষম্যের শিকার হতে চাইনা। তাদের আবেদন নতুন উপজেলা প্রশাসন প্রথম থেকেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করবেন। যাতে এলাকার উন্নয়ন ধাপে ধাপে সম্পন্ন হয়।



আফ্রিকার জানা-অজানা রোগব্যাধি

কাজী জহিরুল ইসলাম

মার্কিন মুলুকের খোদ ডাক্তাররাই স্বীকার করেন আফ্রিকার অনেক রোগব্যাধি এখনো অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে। সামান্য জ্বর হয়ে মানুষ মরে যাচ্ছে। আসলে এটা কি জ্বর? নাকি অন্য কিছু? এর উত্তর কোনো ডাক্তারও দিতে পারেন না। আবার অনেক রোগ আছে, আবিস্কৃত হয়েছে কিন্তু চিকিৎসা নেই। আবার অনেক রোগের চিকিৎসা আছে কিন্তু সচেতনতা নেই বলে রোগী নিজেই জানে না কার কাছে যেতে হবে, চিকিৎসাই বা কী।



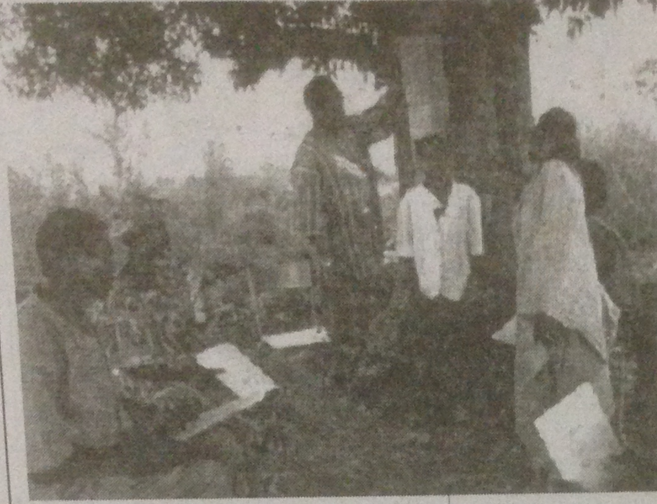
এবার ছুটি থেকে ফিরে এসেই শুনি, হলুদ জ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছে আইভরি কোস্টে। ইতোমধ্যেই নাকি কয়েকজন মারাও গেছে। হলুদ জ্বর একটি ভয়ানক ব্যাধি। এর চিকিৎসা আছে ঠিকই কিন্তু চিকিৎসা সত্ত্বেও মৃত্যুহার খুব বেশি। তবে সুখের কথা, এই রোগের প্রতিষেধক টিকা আছে। হলুদ জ্বর দুই রকমের। একটি হলো জঙ্গলের হলুদ জ্বর আর অন্যটি হলো শহরে হলুদ জ্বর। দুই ধরনের হলুদ জ্বরই ইনফেক্টেড মশার দ্বারা ছড়ায়। জঙ্গলের হলুদ জ্বর সাধারণত বানরের হয়। বানর থেকে মশার মাধ্যমে এটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যে মশা শহরে জ্বরটা ছড়ায় তার নাম এইডেস এইজিপ্টি। এ জাতীয় মশা গাড়ির ফেলে দেয়া চাকা, ফুলদানি, তেলের ড্রাম কিংবা পানির ট্যাংকিতে বংশবিস্তার করে। এখন পর্যন্ত আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া হলুদ জ্বর পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায়নি। হলুদ জ্বর দেখা দিলে মাথা ধরে, মেরুদণ্ডে ব্যথা হয়, মাংসপেশিতে ব্যথা হয়, বমির ভাব হয় এবং অতিরিক্ত জ্বর হয়। রোগী জ্বরের প্রকোপে থরথর করে কাঁপতে থাকে। কিছুদিন রোগে ভোগার পরে একটু ধাতস্থ হয়ে এলে হলুদ জ্বরের ভাইরাস আক্রমন করে কিডনিতে এবং কলিজায়। এর ফলে লিভার ফাংশন খারাপ হয়ে যায়। সমস্ত শরীর ধীরে ধীরে হলুদ হতে শুরু করে, প্রস্রাব হলুদ হয়ে যায়। ইনফেক্টেড মশা কামড়ানোর ৩ থেকে ৬ দিনের মধ্যে এই লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করে।

আরেকটি অসুখের নাম লাসা জ্বর। এই জ্বরের প্রকোপ নাইজেরিয়াতে বেশি। তবে আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও লাসা জ্বর দেখা যায়। সাধারণত ইঁদুরের খাওয়া খাবার খেলে বা ইঁদুর খাবারের ওপর দিয়ে হেটে গেলে এবং সেই খাবার খেলে এই জ্বর হয়। লাসা জ্বরের কোন চিকিৎসা নেই বলে শুনেছি। এই জ্বরে মৃত্যু অবধারিত। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়, লাসা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হলে সেই লাশ আন্তর্জাতিক কোন এয়ারলাইন্স বহন করে না। লাসা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে ২৫ ফুট মাটির নিচে পুতে দিতে হয়। নইলে মরদেহ থেকে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে অন্যদের শরীরে। লাসা জ্বরে আক্রান্ত রোগী সর্বোচ্চ সাতদিন বাঁচে। এই রোগ শরীরের টিস্যুগুলো খেয়ে ফেলে।



আইভরি কোস্টের জঙ্গলে এক ধরনের মাছি আছে এরা বংশবিস্তার করে মানবদেহে। শুনে নিশ্চয়ই শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছে। রোদে যখন আমরা কাপড় শুকোতে দিই তখন এই মাছি কাপড়ের ওপর বসে মনের সুখে ডিম পড়ে। কাপড় রোদ থেকে এনে যদি ভালোমতো ইস্ত্রি না করে পরে ফেলি তাহলেই সেই ডিমগুলো কাপড় থেকে আস্তে আস্তে লোমকূপের ভেতর দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। ব্যস, দুই থেকে তিনদিন। তারপর চামড়া ফুলে এক একটা ফোড়া দেখা দেবে। সেই ফোড়া পাকবে, ব্যথা করবে। এরকম তিন থেকে চারদিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগের পর একদিন ফোড়া ফেটে একটা মাছিশাবড় উড়াল দিয়ে পালিয়ে যাবে।

আফ্রিকানদের প্রধান দুটি খাবারের একটি হলো কাসাভা। পেস্তা আলুর মতো এক ধরনের শেকড়।



কামড়ানি, গলায় প্রদাহ এবং দুর্বলতা।
কিছুদিনের মধ্যেই পেটে ব্যথা, বমির ভাব এবং ডায়রিয়া দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শরীরে রাশ ওঠে, চোখ লাল হয়ে যায়, রোগী হিক্কা তুলতে থাকে এবং শরীরের বাইরে

কাসাভা দিয়ে তৈরি হয় নানান রকমের সুস্বাদু খাবার। এই কাসাভা থেকে একবার ছড়িয়ে পড়ল এক ধরনের মোজাইক ভাইরাস। এই রোগের নাম হয়ে গেল কাসাভা রোগ। ১১৯০ সালে পূর্ব আফ্রিকার আড়াই কোটি মানুষ আক্রান্ত হলো কাসাভা রোগে। তবে সুখের কথা হলো কাসাভা রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুহার তেমন বেশি নয়। এবোলা জ্বরের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। এটা একটা ঘাতক ব্যাধি। এবোলা জ্বর নিয়ে আমেরিকানরা ছবিও বানিয়েছে। সাধারণত এই জ্বর বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের হয়। অর্থাৎ সব স্তন্যপায়ী প্রাণীরই এই এবোলো জ্বর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কঙ্গোর একটি নদীর নামে এই রোগটির নাম রাখা হয় এবোলা। কঙ্গোর এবোলা নদীর পাড়েই এই রোগ ১৯৭৬ সালে প্রথম শনাক্ত করা হয়। চার ধরনের এবোলা ভাইরাস আছে। এর মধ্যে এবোলা জায়ের, এবোলা সুদান এবং এবোলা আইভরি কোস্ট এই তিনটি মানবদেহে আক্রমণ করে। চতুর্থটি হলো এবোলা রেস্টন, এটি মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীকে আক্রমণ করে। এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশের ২ থেকে ২১ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করে। এর প্রাথমিক লক্ষণগুলো হচ্ছে ঘুষঘুষে জ্বর, মাথা ব্যথা, গিরায় ও জয়েন্টে ব্যথা, মাংসপেশিতে চাবানি-

এবং অভ্যন্তরে রক্তপাত হয়। এবোলা এইচএফ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী মারা যায়। তবে দুয়েকজন এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখনো আবিষ্কার করতে পারেননি কেন কেউ কেউ ভালো হয়ে যায় আর বেশিরভাগ রোগী মারা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে যে, যারা ভালো হয়ে যায় তাদের শরীরে এবোলা এইচএফের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো নেচারাল প্রতিষেধক রয়েছে। এবোলা জ্বরে আক্রান্ত রোগীকে শুধু রোগের লক্ষণের ওপর চিকিৎসা করা হয়। যেমন যখন প্রেসার কমে যায়, তখন প্রেসার বাড়ানোর ওষুধ, যখন পাতলা পায়খানা হয় তখন পাতলা পায়খানা বন্ধের ওষুধ দেয়া হয়।
এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘাতকের নাম হলো ম্যালেরিয়া। প্রতিবছর ৩০ থেকে ৫০ কোটি শিশু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, যার ১ কোটি মারা যায়।

এই হতভাগ্য শিশুদের সিংহভাগই আফ্রিকার। এই রোগটিও ছড়ায় আক্রান্ত মশার দ্বারা। আইভরি কোস্টের পৌনে দুই কোটি মানুষের এমন একজনও নেই যার জীবনে একবার ম্যালেরিয়া হয়নি। ম্যালেরিয়া এখন আফ্রিকানদের কাছে ডাল-ভাত। অবশ্য বেশিরভাগ আফ্রিকান এখনো মৃত্যুকেই পরোয়া করে না। আফ্রিকার যেসব দেশ গৃহযুদ্ধের আগুনে পুড়ছে, সেসব দেশের ৫ বছর বয়সী শিশুর হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দিচ্ছে বাবা-মারা। অস্ত্র ঠিকমত কাজ করে কিনা এটা পরীক্ষা করার জন্য ওরা হয়তো একজন পথচারীকেই গুলি করে দিল। যদি লোকটি মারা যায় তাহলে হত্যাকারী আনন্দে দাঁত বের করে হাসে।
আরেক নীরব ঘাতকের নাম এইডস। গড়ে আফ্রিকার ২০ শতাংশ মানুষ এইচআইভি বহন করছে। কোন কোন দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ এই ঘাতক ভাইরাসে আক্রান্ত। আমার বর্তমান আবাস আইভরি কোস্টের ৪৬ শতাংশ মানুষ এইচআইভি ভাইরাস বহন করছে।
আরো কত যে অজানা রোগে ছেয়ে আছে আফ্রিকা কে জানে। সেদিন আমার এক সহকর্মী মানসুর জাহি বলল, ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে যে সন্ত্রাসীর মতো রোদ ওঠে এই রোদে কখনো হাঁটবে না। তখন আকাশ থেকে ঝরে পড়ে হাজারো রোগব্যাধি। তারপরও যখন আবিদজান থেকে গাড়ি চালিয়ে ইয়ামুসুক্রো যাই, দালোআ যাই, বুআকে যাই তখন দেখি পথের দু'পাশে নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ। সবুজের এত প্রাচুর্য,এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর আর কোথায় আছে। এখানে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ। সবুজের ওপরে সবুজ, তার ওপরে সবুজ আর তার ওপরে সুনীল আকাশ। আর এ জন্যই বোধহয় এত রোগ-বালাইকে উপেক্ষা করে প্রতিদিন সৌন্দর্যপিপাসু হাজার হাজার মানুষ পাড়ি জমায় আফ্রিকায়।



- লেখক কবি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা

শিক্ষকতাই আমার জীবন

এপিজে আব্দুল কালাম



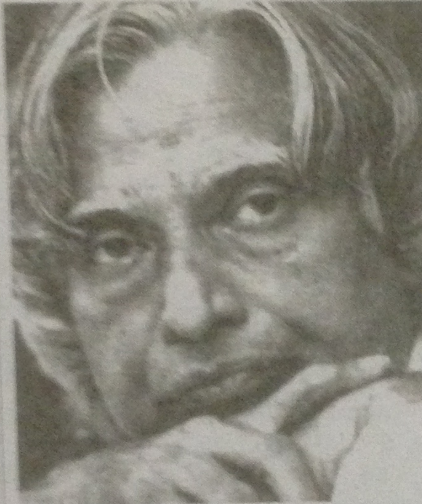
ভারতের রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম দেশের পরমাণু অস্ত্রের জনক। আর এখন ভারতের প্রায় ৫০ কোটি তরুণ প্রজন্মের জন্য আদর্শ। ভারতের সার্বিক উন্নয়ন এবং ২০২০ সাল নাগাদ একে সুপার পাওয়ারে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এপিজে আব্দুল কালাম বলেছেন, এ সময়ের মধ্যে দেশের তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে এবং তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। ব্যক্তিগত আদর্শ, পাক-ভারত শান্তি উদ্যোগ এবং ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে এপিজে আব্দুল কালাম কথা বলেছেন আউটলুক ম্যাগাজিনের সঙ্গে।

আউটলুক : আপনি ভারতের কোটি কোটি তরুণ প্রাণের আদর্শ। কিন্তু আপনার আদর্শ কে ?

এপিজে আব্দুল কালাম: আমার আদর্শ ? অধ্যাপক বিক্রম সারাভাই। তবে এর আগে আমার আদর্শ ছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষক শিবসুব্রামানিয়াম। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। আমার বয়স মাত্র ১০। তিনি আমাকে একদিন পাখি কিভাবে ওড়ে? শেখাচ্ছিলেন। তখন ১৯৪১ সাল। প্রায় ৪৫ মিনিট পর আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রশ্ন করলেন কিছু বুঝেছ? অনেকেই উত্তরে হাত তুলেছিল। কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি। শিক্ষক বললেন, যারা বোঝনি বিকেলে এসো। আমি এবং কয়েক বন্ধু বিকেলে শিক্ষকের কাছে গেলাম। তিনি এক খোলা মাঠে আমাদের পাখির উড়ান দেখালেন।

আউটলুক : তাহলে কি রকেট তৈরির অনুপ্রেরণা আপনি এখান থেকেই পেয়েছেন?

এপিজে আব্দুল কালাম: অনেকটা তাই। পাখির ওড়ার কারণ জানার পর আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তাহলে প্লেন কী করে ওড়ে? উত্তরে শিক্ষক বলেছিলেন, কারণ প্লেনে ইঞ্জিন আছে। আর পাখির আছে প্রাণ। আমি তখন বিজ্ঞান নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। মহাকাশে কী হচ্ছে জানতে চাইলাম। একটি ছোট্ট পাখির ওড়ার রহস্যই আমাকে গণিত এবং পদার্থ বিদ্যায় উৎসাহিত করে। স্কুল পাসের পর মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ভর্তি হলাম। তারপর রকেট ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু করলাম। এখান থেকেই আমার ক্যারিয়ার শুরু। রকেট বিজ্ঞানী হিসেবে অধ্যাপক বিক্রমের শিষ্য হই। অবশ্য ৬০'র দশকে আমাদের রকেট ছিল না।



তাই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির গবেষণা শুরু। আর এরপর পরমাণু অস্ত্র।

আউটলুক : রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব আপনার কাছে কেমন লাগছে?

এপিজে আব্দুল কালাম: ভালই। তবে বিজ্ঞান আমি ছাড়িনি। এখন আমি তিনটি জিনিস নিয়ে সময় কাটাই। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি ভবনের সুন্দর প্রকৃতি। আমার ফুল ও ভেষজ বাগান। দ্বিতীয়ত, প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা শতাধিক শিশুর সঙ্গে আড্ডা। আর তৃতীয়ত, বিজ্ঞান চর্চা। বিশেষ করে আমার এক ছাত্রকে পিএইচডি করতে সহায়তা করা।

আউটলুক : আর কি?

এপিজে আব্দুল কালাম: শেষোক্ত হচ্ছে, ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা। আমার রাষ্ট্রপতি হওয়ার একমাত্র কারণ এটি। আমি দেশের মানুষ এবং নেতাদের উন্নত জাতি গড়ার পথ দেখাতে চাই।

আউটলুক: দেশের ৫৪ শতাংশ জনসংখ্যার বয়স ২৫ বছরের নিচে। এদের নিয়ে আপনার ভাবনা কী?

এপিজে আব্দুল কালাম: হ্যাঁ, এ ৫৪ শতাংশ জনগোষ্ঠীর আমাদের সবচে' বড় সম্পদ। ১৮৫৭ সালে এদেরকেই স্বাধীনতার জন্য লড়তে বলা হয়েছিল। এরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাই এদের উপযুক্ত ব্যবহার জরুরি।

আউটলুক: এ তরুণ প্রজন্মের জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনাও কি জরুরি নয়?

এপিজে আব্দুল কালাম: অবশ্যই। তবে এ দিক-নির্দেশনার শুরু পরিবার থেকেই হতে হবে। তাছাড়া এদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য বৃক্ষরোপণের মতো আন্দোলন তৈরি করতে হবে। তবে সবচে' বেশি জরুরি দূরদৃষ্টির। তরুণরা ভবিষ্যতে কী করবে তার একটা দিক- দর্শন তাদের শুরু থেকেই থাকতে হবে।

আউটলুক: ভারতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারীদের ভাগ্য সবসময় খারাপ হয় কেন।

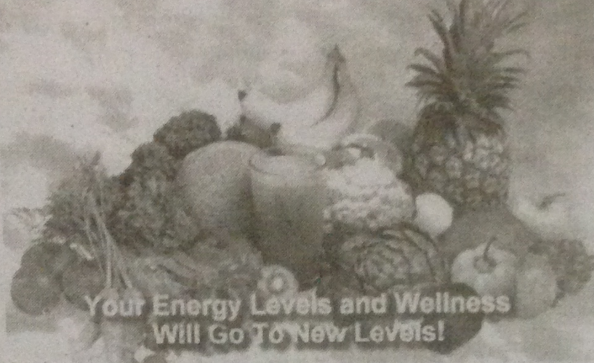
এপিজে আব্দুল কালাম: আমি লোকসভা এবং রাজ্যসভায় এ নিয়ে কথা বলেছি। দুর্নীতি দমনের জন্য যে কোনও ধরনের আইন ও করা যেতে পারে। তবে দুর্নীতি প্রকৃতপক্ষে দমন করতে প্রয়োজন-সৎ বাবা, মা এবং শিক্ষক। কারণ যে শিশু ছোট থেকে অসৎ হতে শেখে সে বড় হয়ে দুর্নীতি করবেই।

আউটলুক: সরকার যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয় তাহলে?

এপিজে আব্দুল কালাম: আসলে সরকারের একার পক্ষে এ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। শত কোটি জনসংখ্যার এ দেশে দুর্নীতি দমন সহজ কথা নয়। তবে আমি আশাবাদী। দুর্নীতি মুক্ত ভারত আন্দোলনের সূচনা করতে হবে

অজ্ঞতাই পুষ্টি সমস্যার অন্যতম কারণ

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তা সত্ত্বে বাংলাদেশের অপুষ্টি সমস্যা প্রকট। ১৯৯৯ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশের ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের শতকরা ৫৫ জনের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়; এদের শতকরা ৬১ জনের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম। শহরে একটি বস্তির পুষ্টি জরিপে দেখা যায়, এদের অর্ধেকেরও বেশি অপুষ্টির শিকার। বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণ নিঃসন্দেহে দারিদ্র্য। সহজ কথা বলতে গেলে, দারিদ্র্য এবং খাদ্যের অভাবই অপুষ্টির প্রধান কারণ। জনগণের আয় না বাড়লে কিংবা কেনার সামর্থ্য না বাড়লে বাজারে খাদ্যের প্রাচুর্য কিংবা স্বাস্থ্য শিক্ষা অপুষ্টি দুর করতে পারে না। আজকাল অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, একমাত্র দারিদ্র্যই কি অপুষ্টির কারণ?



আমরা যদি উন্নয়নশীল দেশগুলোর পুষ্টি পরিস্থিতির দিকে গভীরভাবে নজর দেই, তাহলে দেখতে পাই সর্বত্রই শিশু-কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রধানত অপুষ্টির শিকার। বিশেষ করে শিশুরা মায়ের বুকের দুধ ছেড়ে যখন বড়দের খাবার খেতে শুরু করে তখনই অপুষ্টির শিকার হয়। আর এটা যে শুধু দরিদ্র পরিবারের শিশুদের মধ্যে ঘটছে, তা কিন্তু নয়। সচ্ছল, এমনকি অতিসচ্ছল পরিবারের শিশুরাও এ সময়ে অপুষ্টিতে ভুগছে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এ সময়ে অপুষ্টির কারণ মুলত দারিদ্র্য কিংবা খাদ্যের অভাব নয়; বরং পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সঠিক খাদ্যাভাসের অভাবে এমনটি ঘটে থাকে। অপুষ্টি সমস্যা একই মুদ্রার অপরপিঠ। পুষ্টি অভাব যেমন নানারকম শারীরিক, মানসিক ও অর্থসামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে; স্থুলতাও তেমন নানারকম শারীরিক-মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করে। বিশ্বে প্রোটিন ক্যালরির অভাবজিনত অপুষ্টির সমস্যা সবসময় প্রাধান্য পেলেও অন্যান্য খাদ্য উপাদান বিশেষত মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টের অভাবজনিত অপুষ্টির কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, আসলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিবাসীদের প্রতি তিনজনের একজন কোনো না কোনো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের অভাবে ভুগছে। প্রকৃত পক্ষে প্রোটিন-ক্যালরির অভাবের চেয়ে মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টের অভাব আরো বেশি সর্বব্যাপী এবং প্রকট। মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টের অভাবজনিত সমস্যাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ভিটামিন 'এ'-এর অভাব, আয়োডিনের অভাব, লৌহ স্বল্পতাজনিত রক্তশূন্যতা ইত্যাদি। মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টের অভাব এবং প্রোটিন-ক্যালরির অভাব হলে সৃষ্ট অপুষ্টি শুধু স্বাস্থ্যহানি করে, এটাই প্রধান বিষয় নয়। এর ফলে সামগ্রিকভাবে কর্মদক্ষতা কমে যায়, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যাহত হয়, পরিবারের আর্থিক সমৃদ্ধি কমে যায়। যার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়ে। দেশের জনসাধারণের প্রতিটি সদস্যের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমেই কেবল এ সমস্যা দূর হতে পারে। পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞতা, কি খাব, কোনটা খাব এবং কেন খাব জানা না থাকলে এবং সে অনুসারে নিয়ম মেনে না চললে পুষ্টি সমস্যা দুর করা সহজ নয়।

এ জন্য বলা হচ্ছে শুধু দারিদ্র্য নয়, পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞাত ও অপুষ্টি সমস্যার অন্যতম কারণ। দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি অজ্ঞতার অন্ধকার দুর করাও জরুরি। এজন্য পুষ্টি সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষাদান ও প্রচার অপরিহার্য। এ বিষয়ে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিশেষ ভূমিকা পালন করা উচিত। একটি হিসেবে দেখা যায়, কেনো খাদ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানি যদি স্বাস্থ্যকর খাবারের বিজ্ঞাপন প্রচারে মাত্র ১৫ ডলার খরচ করে, খাদ্য বিপণনের ফলে তার ১০০০ ডলার লাভ হয়। পুষ্টি শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দিলে এর পরিমাণ আরো বেশি হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন যুগ আগে যখন কম সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত মারজারিন বাজারজাত করা হয়, তখন এর পাশাপাশি হৃদরোগ প্রতিরোধে কম সম্পৃক্ত চর্বিযুক্ত খাবারের বিক্রির হার যেমন বেড়েছে, তেমন বিগত ১৫ বছরে হৃদরোগ মৃত্যুর হার তুলনামুলক কমেছে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা নানারকম লোভনীয় কিন্তু শরীরের জন্য ক্ষতিকর খাবারের দিকে ঝুকে পড়ছে। এর ক্ষতিকর প্রভাবে দু-এক দিন কিংবা দু-এক বছরে প্রকাশ পাবে না। কয়েক যুগ পর নানারকম অসংক্রামক ব্যাধির (যেমন- হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক) মৃত্যু হার প্রমাণ করবে পুষ্টি সম্পর্কে আমরা জনগণকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছি কিনা। একদিকে দারিদ্র্যের ভারে জর্জরিত কিন্তু পুষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ জনগণের প্রোটিন ক্যালরির অভাবজনিত ও মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টের অভাবজনিত নানাবিধ রোগব্যাধি; অপরদিকে তুলনামুলকভাবে সচ্ছল কিংবা অতিসচ্ছল জনগণের স্থূলকায়ত্ব ও অপপুষ্টিজনিত সমস্যা থেকে সৃষ্ট নানবিধ রোগব্যাধি-এ বিবিধ বিপরীতমুখী স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ ও লাঘবের জন্য আমাদের এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আর এজন্যই দরকার জনগণের সঠিক পুষ্টি শিক্ষা, পুষ্টি জ্ঞান ও পুষ্টি তথ্য।

– ডা.এ. আর.এস. সাইফুদ্দিন একরাম
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ

ভ্রমন স্বাস্থ্য কথা

ঈদ ভ্রমণে স্বাস্থ্য সতর্কতা

আসছে ঈদ। ঈদে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে দেখা করতে অনেকেরই দূর-দূরান্তে ভ্রমণে যেতে হয়। তাই প্রয়োজন ভ্রমণপূর্ব প্রস্তুতি। সাধারণের জন্য এবং বিশেষ করে রোগীদের জন্য এই প্রস্তুতি হতে হবে সুচিন্তিত, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। ভ্রমণপূর্ব এই প্রস্তুতি নিয়ে

লিখেছেন ডা. ফাহিম আহমেদ রুপম

ঈদে ভ্রমণের পূর্বে সকলের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে-

১) ঈদের ভ্রমণে দূর-দূরান্তে যেতে শরীর ও মনের ওপর যেন অতিরিক্ত চাপ না পড়ে সে লক্ষ্যে ভ্রমণ ধীরে-সুস্থে ও হাতে সময় নিয়ে করা ভাল।

২) জার্নিতে প্রয়োজন হলে নিজের সঙ্গে রাখা শুকনো খাবার খেতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এক্ষেত্রে নিরাপদ পানি পান করতে হবে। এ জন্য ফোটানো পানি বা মিনারেল ওয়াটার এবং হোমমেড খাদ্য খাওয়া যেতে পারে। কোন অবস্থাতেই ফেরিওয়ালা, রাস্তা কিংবা হোটেলের খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। এমনকি টিউবওয়েলের পানিও পান করা নিষেধ।

৩) জার্নির পোশাক সুতি কাপড়ের ও ঢিলেঢালা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪) একটি ব্যাপার যে কোন রোগীর ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে সেটি হল- তার প্রেসক্রিপশনটি সঙ্গে রাখা এবং সেই অনুযায়ী পুরো কোর্সের ওষুধ সঙ্গে কিনে রাখা। জার্নিতে প্রত্যেক রোগীকে তার চিকিৎসকের নির্দেশ পালন করতে হবে। ওষুধের ক্ষেত্রে আপনি যে ওষুধটি খাচ্ছেন তা পরিমাণমতো সঠিক ডোজ অনুযায়ী খাচ্ছেন কিনা, তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫) ঈদের খাবারে ভূরিভোজ পরিহার করতে হবে। কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার, জমে যায় এরূপ তেল যেমন- ঘি, ডালডা দিয়ে রান্না করা খাবার পরিত্যাগ করাই ভাল। জার্নিতে বা ঈদের খাবারে ডিমের কুসুম, মাছের ডিম, গরু বা খাসির মাংস অর্থাৎ কোলেস্টেরল বাড়ায় এরূপ খাদ্য গ্রহণ না করাই উত্তম। জার্নির আগে ওভারইটিং, দুধের জিনিস ও ফ্যান্টি ফুড না খাওয়াই উচিত।

৬) জার্নিতে ফল ভালমতো ধুয়ে খেতে হবে।

৭) যাদের এডভান্সড হার্ট ডিজিজ, লিভার সিরোসিস এবং জন্ডিসের সমস্যা আছে তাদের জার্নি না করাই বাঞ্ছনীয়। এবার আসা যাক কোন ধরনের রোগীদের কি ধরনের সতর্কাবস্থা অবলম্বন করতে হয়-

হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে- হৃদরোগীদের প্লেনে জার্নি পরিহার করার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে বাস-কোচের চেয়ে ট্রেনে জার্নি করাটাই আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যসম্মত। যে কোন ভ্রমণে অনেকক্ষণ পা ঝুলিয়ে রাখতে হয় বলে হৃৎপিণ্ডের অ্যাবজরবেশন ক্ষমতা কমে যায় বলে পেটে বিশেষ করে পায়ে পানি এসে যেতে পারে। সে জন্য জার্নির ফাঁকে ফাঁকে পা দুটোকে ভাঁজ করে চেয়ারে আড়াআড়িভাবে রেখে এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। বুক ব্যথা বা বুক অস্বস্তি যাকে অ্যানজাইনা বলা হয়ে থাকে, তার জন্য নাইট্রোগ্লিসারিন জাতীয় ওষুধ বা অ্যারোসোল স্প্রে সঙ্গে রাখতে হবে। একিউট ইমার্জেন্সি রোগীদের জার্নি পরিহার করে রেস্টে থাকা ভাল।

সার্জারি রোগীদের ক্ষেত্রে- পেটের বিভিন্ন ধরনের অপারেশন যাদের হয়েছে তাদের ভারি জিনিস তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে। যাদের ইদানিং সার্জারি হয়েছে তাদের বাসে হেলান করা চেয়ারে শুয়ে কিংবা অ্যাম্বুলেন্সে করে জার্নি করতে হবে।

মেডিসিন ও ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে-ডায়াবেটিস যারা তাদের জার্নিতে কোন বাধা নেই। তবে অনেক দূরের জার্নিতে যেহেতু শরীরের ওপর স্ট্রেস পড়ে সে জন্য এ ধরনের রোগীদের সঙ্গে যাদের এডভান্সড কিডনি ডিজিজ, হার্ট ডিজিজ বা চোখের কোন মারাত্মক সমস্যা আছে তাদের এই জার্নি পরিত্যাগ করাই উত্তম। আজকাল ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে সুগারের পরিমাণ কমিয়ে রাখার জন্য ওষুধের পাশাপাশি খাওয়ার ১৫ মিনিট আগে নোভোনরম, নোভোরেপিড, স্টারলিক্স জাতীয় ওষুধ খাওয়ার জন্য চিকিৎসকরা বলে থাকেন। এই রোগীদের জন্য খাদ্যদ্রব্য মিষ্টি করার জন্য এসপারটেম বা ক্যান্ডেরেল পাউডার মিশিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে খাওয়া যেতে পারে। হাঁপানি রোগীদের ইনহেলার সঙ্গে রাখতে হয় এবং মাস্ক ব্যবহার করতে হয়। সর্দি-কাশির জন্য স্পেসিফিক ওষুধ নেই তবে এন্টিহিস্টামিন খাওয়া যেতে পারে। সামান্য ডায়রিয়া হলে ওরাল স্যালাইন এবং ইমোটিল জাতীয় ওষুধ খেতে হয়। জ্বর হলে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সঙ্গে রাখতে হয়।

পেটের বিভিন্ন অসুখের ক্ষেত্রে- বাইরের বাসি-পচা, দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেলে ডায়রিয়া বা ফুড পয়জনিং হওয়ার আশংকা থাকে। তাই চিকিৎসকের নির্দেশে এসব ক্ষেত্রে টেট্রাসাইক্লিন, মেট্রোনিডাজল, লোপ্যারামাইড ও সিপ্রোফ্লোক্সাসিন জাতীয় ওষুধ সঙ্গে রাখা ভাল। বমি বমি ভাব বা বমি রোধ করার জন্য এবং মর্নিং সিকনেসের জন্য স্টিমেটিল, সিনারন, মটিলন জাতীয় ওষুধ জার্নির আগেই খেয়ে নেয়া ভাল।

গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে প্রথম তিন মাস ও শেষ দুই মাস যে কোন জার্নি পরিহার করা উত্তম। ট্রেনে যেহেতু শুয়ে-বসে আরামে যাওয়া হয় তাই গর্ভবতীদের এভাবেই ভ্রমণ করা উচিত।

বাসের জার্নিতে গর্ভবতীদের রক্তক্ষরণ হতে পারে। প্লেনে জার্নি করলে গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে আরলি প্রেগনেন্সিতে যে অ্যাবরশন এবং লেট প্রেগনেন্সিতে প্রি-টার্ম লেবার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে যাদের পেটে গ্যাস আছে তাদের এন্টাসিড সিরাপ বা ট্যাবলেট কাছে রাখা ভাল।

কুরবানির প্রয়োজনীয় কিছু সতর্কতা



কুরবানি-আল্লাহর নির্দেশ, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন এবং গুনাহ মাফ করে নেয়ার এক সর্বোত্তম সওদা। আল্লাহ পাক বলেন, 'আমার নিকট তোমাদের কুরবানির রক্ত-মাংস পৌছে না, পৌছে তোমাদের তাকওয়া।' (সুরা হজ ৩৭) এ বিবেচনায় কুরবানি কেবল গোশত খাওয়ার উৎসব নয়, বরং এটি ত্যাগের এক মহান ইবাদত। এ ইবাদত সহি হওয়ার জন্য কিছু সতর্কতা জরুরি।

১) নিয়ত খালেছ হাওয়া। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও সন্তুষ্টি জন্যই সাধ্য অনুযায়ী পশু ক্রয় ও আল্লাহর নামে কোরবানি করা। কারো নামে নয়, বরং কারো পক্ষ থেকে। তাদের জবেহ করার সময় তোমার আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর' (সুরা হজ : ৩৬)।

২) কুরবানির পশু ক্রয়ে নানা রকম সামাজিক ইগো-ইমেজের প্রতিযোগিতায় আমরা অনেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। হাঁকানো মুল্যের মোটা-তাজা পশু কিনে পাড়া-মহল্লা ঘুরিয়ে এনে বাড়ির সামনে প্রদর্শনের জন্য বেঁধে রাখেন অনেকে। এ ধরনের কুরবানিতে সামাজিকতা বাঁচে বটে; কিন্তু পশুর আগে জবাই হয় নিজের ঈমান।

৩) আল্লাহর দেয়া সাধ্য সত্ত্বেও অনেকে হাড় জিরজিরে দমসর্বস্ব পশু কেনেন, বিক্রি হন নিজের হীন কৃপণ মানসিকতার কাছে। এ কাজ থেকেও সাবধান হতে হবে।

কারণ হযরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর হুকুমে নিজের একমাত্র প্রিয় সন্তানকেই কুরবানি করতে ছুরি চালিয়েছিলেন অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের কাছে পুত্রের এবং নিজের জান কেন এমন কিছু নেই যা ত্যাগ করা যায় না। পশু কেনার সময়ও সে বিবেচনা থাকা উচিত।

৪) সাধারণত গ্রামের কুরবানির হাটে দেখা যায়, পশু কেনার সময় ক্রেতা বিক্রেতাকে অনেকটা ত্যক্ত-বিরক্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে রশি টেনে নিয়ে আসেন। মূল্য পরিশোধেও করেন টালবাহানা। কুরবানির পরও টাকা বাকি রাখেন কেউ কেউ।

৫) একাধিক ভাগীদার নিয়ে কুরবানি করার ক্ষেত্রে অন্যসব ভাগীদারও যেন হালাল পেশাজীবী এবং পরহেজগার হন সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

৬) গোশত বন্টন করার সময় অনেকে লোভে আক্রান্ত হন। নিজের জন্য পছন্দমত গোশত দিয়ে ভাগ তৈরি করেন। ওজনেও কম-বেশি করেন কেউ কেউ। সাবধান-হক্কুল ইবাদ নষ্ট করে হক্কুল্লাহ সম্ভব নয়।

৭) খালাশি ও গোশত বানানোর কাজে নিয়োজিত লোকজনকে আল্লাহর ওয়াস্তে অংশ থেকে গোশত দিয়ে বিদায় করেন অনেকে। এটা শরিয়তসিদ্ধ নয়, আলাদা অর্থের বিনিময়ে মজুরি মূল্য বুঝিয়ে দিতে হবে।

৮) বাজারে প্রচলিত হাসিলের টাকা বাঁচানোর জন্য অনেকে মূল্য বলার সময় মিথ্যার আশ্রয় নেন। হাসিলের টাকা মেরে দিতে ক্রেতা-বিক্রেতা কাছে রশি দিয়ে হাট পার করিয়ে পরে পশু গ্রহণ করেন। সাবধান- ক'টা টাকার জন্য কুরবানির বরবাদ হয়ে যাবে।

৯) গরিব, মিসকিন ও দরিদ্র আত্মীয়স্বজনকে কুরবানির গোশত বিতরণে আল্লাহর নির্দেশ থাকলেও অনেকে তাদের যৎসামান্যই দেন বরং ধনী আত্মীয়র বাড়িতে গরু-মোষের রান পাঠিয়ে আত্ম-অহম জাহির করেন। বাকিটা করেন ফ্রিজবন্দি। মনে রাখতে হবে, কুরবানি আল্লাহর নির্দেশ, নিছক গোশত খাওয়া নয়।

১০) চামড়া বিক্রির সময় অনেকে এমন ছল-চাতুরির আশ্রয় নেন যে, বেমালুম ভুলে যান আল্লাহ সবকিছু দেখছেন এবং শুনছেন। কোথায় চামড়ার টাকা দান করবেন তা নিয়ে জড়িয়ে যান হীন দ্বন্দ্বে। সব কাজের মতো আল্লাহর ভয় থেকে এ কাজটিও করতে হবে। আল্লাহ সবার কুরবানিকে তার খুশির কারণ এবং আমাদের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন।

-আবু হেনা মুহাম্মদ মুহিব

সম্পর্কের কথা

প্রতিবেশীর হক ও কর্তব্য

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন "তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করোনা। আর পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, নিকট প্রতিবেশী, মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতি সদাচরণ করো নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক-গর্বিতজনকে পছন্দ করেন না।" (সূরাহ নিসা,৩৬)

উপরোক্ত আয়াতে কারীমের মর্মানুধাবনে বুঝা যায়- আল্লাহ তা,আলা সর্বাগ্রে নিজের হক, অতঃপর যথাক্রমে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর হকের প্রতি জোর দিয়েছেন।

প্রশ্ন জাগতে পারে, প্রতিবেশী কি শুধু সে-ই যে নিকটবর্তী বাড়ীর অধিবাসী? এর উত্তরে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, একদা একব্যক্তি নবীজির (সাঃ) নিকট এসে অভিযোগ করলো-"হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রতিবেশীর মধ্যে যে আমার অধিক নিকটে, সে আমাকে অধিক কষ্ট দেয়। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আলী (রাঃ) কে এই ঘোষণা দানের জন্য নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেকের জন্য তার পাশের চল্লিশ ঘর পর্যন্ত তার প্রতিবেশী। যে ব্যক্তির অত্যাচার হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে যেতে পারবে না।" (তিবরানী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন-"ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয়, যার অত্যাচার ও অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়।" (বুখারী শরিফ)

অপর হাদীসে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল, সে যেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাকেই কষ্ট দিল।" (আবুশ-শাইখ)

নিম্নে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কিত কিছু বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে, এ কাজগুলো সচেতনতার সহিত পালনের দ্বারা ইনশাআল্লাহ আশা করা যায়-প্রতিবেশীর হক আদায় হবে-

(১) কোন প্রতিবেশী যদি কোন ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থনা করে, তবে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দ্বারা প্রতিবেশীর সাহায্য করতে হবে।

(২) কোন প্রতিবেশী রোগাক্রান্ত হলে, তার প্রতি হৃদয় থেকে সহানুভূতি-সমবেদনা জানাবে এবং নিজ সাধ্যানুযায়ী তার সেবা-শুশ্রুষায় আত্মনিয়োগ করবে।

(৩) প্রতিবেশী কখনো দাওয়াত করলে, তা সাদরে গ্রহণ করবে এবং শত ব্যস্ত তায়ও নিমন্ত্রণস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

(৪) কোন প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে, তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করবে।

(৫) প্রতিবেশী বিপদগ্রস্ত হলে, সাধ্যানুযায়ী তাকে বিপদমুক্ত করার চেষ্টা করবে।

(৬) কোন সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করলে, প্রতিবেশীর বাড়ীতেও কিছু পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)সাহাবী হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ) কে বলেন-" হে আবু জর ! যখন তোমার ঘরে কোন খাদ্য প্রস্তুত করো, তখন তাতে একটু পানি বেশী দিয়ে খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে নিও এবং তা থেকে প্রতিবেশীদের জন্য কিছু খাদ্য পাঠিও।" (বুখারী ও মুসলিম)

(৭) প্রতিবেশীর ঘরের সম্মুখে ময়লা-আবর্জনা ফেলবে না এবং তাদের চলার পথে কষ্টদায়ক কোন বস্তু থাকলে, তা সরিয়ে ফেলবে।

(৮) প্রতিবেশীর কষ্ট হয়- এমন কাজ কখনো না করা উচিত। প্রয়োজন রোধে প্রতিবেশীর অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে নিজের ঘরও উঁচু করা যাবে না।

(৯) প্রতিবেশীর দোষ অন্যের নিকট বলে না বেড়ানো এবং কোন দোষ-ত্রুটি থাকলেও যথাসম্ভব তা গোপন রাখার এবং গোপনে সংশোধনের চেষ্টা করা কর্তব্য।

(১০) প্রতিবেশীর সহিদ কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ লিপ্ত হবে না। এমনকি কারো সহিত যদি ঝগড়া লাগে, নিজের সাধ্যানুযায়ী ন্যায়ভাবে তা মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।

(১১) কোন দুষ্ট লোকের মুখে প্রতিবেশীর সম্পর্কে কোন দোষ শুনলেও কখনো প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য করবেনা।

(১২) প্রতিবেশী যদি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হয়, তথাপিও তার সহিত নম্রতার সহিত কথা বলা এবং হিকমতের সহিত উপদেশ প্রদাণ করা উচিত।

(১৩) প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর প্রতি কখনো কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করবে না।

(১৪) প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে আদর-যত্ন করবে। মাঝে মাঝে কিছু খাবার কিনে তাদের হাতে দিবে। বিশেষ করে অসহায় ইয়াতীম সন্তানদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিবে।

(১৫) নিজের কোন কাজ দ্বারা প্রতিবেশীর ক্ষতিসাধন করবে না এবং প্রতিবেশীর প্রতি অত্যাচার করবে না।

অনেক প্রতিবেশীদের জমি দখল করে নেয় বলে সংবাদ পাওয়া যায়। অথচ হাদীস শরীফে আছে-"যে ব্যক্তি অন্য কারো এক বিঘত পরিমাণ জমিও অত্যাচার করে দখল করবে, কিয়ামতের দিন তার ঘাড়ে সাত তবক জমিন চাপিয়ে দেয়া হবে।"(বুখারী ও মুসলিম)

বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) ১০ প্রকার লোককে জালিম সাব্যস্ত করেছেন-তন্মধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি, যে নিজে পেট পুরে আহার করে, অথচ তার প্রতিবেশী অর্ধাহারে অনাহারে দিন গুজরান করে।"

যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ হযরত আবুল লাইছ সমরকন্দী (রহঃ) বলেন-"চারটি কাজ করলে প্রতিবেশীর সহিত পূর্ণ সদাচরণ করা হয়। যথা-

(১) নিজের নিকট যা আছে, তা দ্বারাই প্রতিবেশীর সহযোগিতা করা।

(২) প্রতিবেশীর নিকট যা আছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করা এবং অন্তরে তার আশাও পোষণ না করা।

(৩) প্রতিবেশীর মনে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া।

(৪) প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে কষ্ট পেলে, তা হাসিমুখে সহ্য করা।

প্রতিবেশীর হক আদায় সম্পর্কে হাদিস শরীফে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সকল মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে-কোনভাবেই প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া এবং তাদের সব রকম সাহায্য-সহযোগীতা করা।

হাফেজা ফাতিমা তাবাসসুম

মায়ের দুধ শিশুর জন্য অপরিহার্য

বাচ্চার জন্য মায়ের দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ বাচ্চার সমস্ত পুষ্টিকর চাহিদা মিটাতে সক্ষম। তারপর ৬ মাস বয়সের পর থেকে মায়ের দুধের সাথে অন্যান্য স্বাভাবিক খাদ্য চালিয়ে যেতে হবে ২ বছর পর্যন্ত।

একটি সুস্থ বাচ্চাকে ডেলিভারির ১/2 ঘন্টা পর ব্রেষ্টফিডিং বা স্তনের দুগ্ধ পান করা যায়। প্রথম দিকে স্তন থেকে যে গাঢ় হলুদ বর্ণের পদার্থ বের হয় তাকে কলোষ্ট্রাম বলে, এই কলোষ্ট্রাম পানে রোগ প্রতিরোধে উত্তম ভূমিকা রাখে।

ব্রেষ্ট ফিডিং এর উপাদান-

১। হাই প্রোটিন
২। ভিটামিন এ ৩। সোডিয়াম
৪। ক্লোরাইড ৫। কাবহাইড্রেট
৬। ফ্যাট ৭। পটাসিয়াম
৮। এ্যান্টি বডি আইজি-এ, আইজি-জি, আইজি-এম ৯। পানি

ব্রেষ্ট ফিডিং পদ্ধতি- ৩টি

১। চাহিদা অনুযায়ী- বাচ্চা কাঁদলে দুধ দিতে হবে।
২। সময় অনুযায়ী- নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী দুধ দিতে হবে।
৩। পরিমান অনুযায়ী- ইহা খুব একটা সুপরিচিত নয় এবং বিষয়টা একটু জটিল ও বটে।

উপকারীতা-

১। ইহা পরিস্কার, বিশুদ্ধ এবং প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না।
২। বাচ্চার ৬ মাস বয়স পর্যন্ত সব প্রকার পুষ্টির চাহিদা মিটায়।
৩। ইহা বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে এবং শিশুকে পরিপূর্ণভাবে সবদিক দিয়ে বিকাশ করে।
৪। ইহা সহজ প্রাচ্য এবং বাচ্চার প্রয়োজন মাপিক সঠিক তাপমাত্র যুক্ত।
৫। স্তন দানের ফলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রন হয়ে থাকে এবং জরায়ু আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসে ফলে দেহের সৌন্দর্য ফিরে আসে।
৬। দুধ চুষার ফলে বাচ্চার দাঁত ও মাড়ী সুগঠিত হয়।
৭। ইহার জন্য অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয় না।
৮। স্তন দানের ফলে মায়ের ও বাচ্চার মধ্য একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ঘটে।



৯। স্তন দানের ফলে মায়েদের অনেক রোগ হতে বাঁধা দেয়।

নিষেধ ঃ-

১। টিউবারকুলসিস মায়ের।
২। সিভিয়ার কার্ডিয়াক ফেইলুর ডিজিজ।
৩। থাইরোটক্সিকোসিস
৪। ব্রেষ্ট অব দা ইনফ্যাকশন/ক্যান্সার
৫। পিওরপিরিয়াল সাইকোসিস
৬। এইডস (AIDS)

-- ডাঃ সুরাইয়া আকতার (সুমি)
বিএইচএমএস (ডিইউ)

তাঁবুর নিচে গোটা শহর

একটি তাঁবুর নিচে যদি একটি শহর গড়ে তোলা হয় তবে দৃশ্যটি



কেমন দাঁড়াবে? অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, এমনই এক তাঁবু তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে কাজাখস্তানের সরকার। রাজধানী আসতানায় এই তাঁবুর নিচে থাকবে আরো একটি ছোটখাটো শহর। তাঁবুটি হবে স্বচ্ছ। ৫০০ ফুট উচ্চতার তাঁবুটির ডিজাইন করছে ব্রিটিশ স্থপতি নরম্যান ফস্টার। আর তা তৈরিতে সময় নেবে মাত্র এক বছরের মতো।

সূর্যরশ্মী থেকে তাপ গ্রহণ করে অভ্যন্তরভাগে গ্রীষ্মকালের পরিবেশ তৈরি করতে পারে এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি হবে এই তাঁবু। মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি 'স্তেপ'-এর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আসতানায় শীতকালে তাপমাত্রা হিমাংকের ৩০ ডিগ্রি নিচে নেমে আসে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই তাঁবুর একটি ত্রিমাত্রিক মডেল সম্প্রতি কাজাখ প্রেসিডেন্ট নুর সুলতান নাজারবায়েভ উন্মোচন করেন। এর আয়তন হবে ১০টি ফুটবল স্টেডিয়ামের চেয়েও বড়। এর নিচে একটি শহরের যাবতীয় উপকরণ তথা- পার্ক, সড়ক, খাল, শপিং সেন্টার, গলফ কোর্স- সবকিছুই থাকবে। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া সৃষ্টির ফলে বাইরের তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে হলেও এই তাঁবুর নিচে জনগণ টেনিস খেলা বা নৌকা বাইচে অংশ নিতে পারবে। রাস্তার পাশে বসে ধুমায়িত কফির কাপে চুমুক দিতেও সমস্যা হবে না। স্থপতি ফস্টার আসতানায় একটি কাচের পিরামিডেরও ডিজাইন করেন। তবে এর নির্মাণ দায়িত্বপ্রাপ্ত তুর্কি কোম্পানির প্রধান ফেত্তাহ টামিনস বলেন, আগে কখনো এ ধরনের জিনিস নির্মিত হয়নি। তা ছাড়া প্রকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা একটি কঠিন প্রকল্প। এর পঁরও তিনি মাত্র ১২ মাসের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ করার ব্যাপারে আশাবাদী।

তবে এটা বড় ধরনের একটি ঝুঁকির কাজ, এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই। ১০ বছর আগে প্রেসিডেন্ট নাজারবায়েভ রাজধানী আলমাতি থেকে আসতানায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। তখন থেকে এর নির্মাণের পেছনে ব্যয় হয়েছে দেড় হাজার কোটি ডলারের বেশি। তবে প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ আরো বেশি বলে অনেকের ধারণা। তেলসমৃদ্ধ দেশটির জন্য অবশ্য অর্থ কোনো সমস্যা নয়। এরপরও সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেছেন যে, রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্তটি ছিল তার নেয়া সবচেয়ে বড় ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ। সে সঙ্গে বড় অর্জনও বটে। প্রেসিডেন্ট বলেন, স্তেপ-এ বাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলা যাবে তা কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি। বিবিসি

পরিচর্যার কথা

গর্ভাবস্থায় পরিচর্যার দিকে নজর দিন

সিমিলিয়া ডেস্ক ঃ নারীর মাতৃত্ব নারী জীবনের সফলতা। আকাঙ্খিত মাতৃত্ব নারীর জীবনে অপূর্ব সুখের অনুভূতি এনে দেয়। তবে মা হওয়ার পূর্বে তার শরীর মা হওয়ার উপযুক্ত কিনা তা অবশ্যই পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। কোন রকম অসুখ, যা মা হওয়ার জন্য বেশি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা গর্ভের আগে সারিয়ে নেওয়া হবু মায়ের জন্য যেমন ভালো তেমনি ভালো পরিবারের নতুন সদস্যের সহ পুরো পরিবারের।

নিরাপদ মা ও সন্তানের জন্য গর্ভাবস্থায় পরিচর্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অধিকাংশ বিবাহিত নারীর জীবনে গর্ভাবস্থায় (প্রথম গর্ভ) ৪০ সপ্তাহ তার পরবর্তী জীবনের ৪০ বছরের থেকেও বেশী ঘটনাবহুল, বেশি বিপদসঙ্কুল ও দুর্ঘটনাপূর্ণ হতে পারে।

গর্ভাকালীন নিয়মানুয়াী নারীকে গর্ভস্থ শিশুকে পরীক্ষা করাও নির্দেশ দেওয়াকে গর্ভাবস্থায় পরিচর্যা বলে। এই পরিসেবা যে দেশে যত বেশী সে দেশে গর্ভজনিত কারণে মা ও শিশুর মৃত্যু সংখ্যা তত কম। সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ শিশুর জন্য আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব গর্ভাবস্থায় পরিচর্যা করানো এবং



গর্ভবতীর জন্য স্নেহমমতা জড়ানো হাত দুটো বাড়িয়ে দেওয়া গর্ভাবস্থায় পরিচর্যার উদ্দেশ্যঃ-

* গর্ভজনিত কারণে মা ও শিশুর মৃত্যু প্রতিরোধ করা।

* অন্তঃসত্ত্বা নারীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করা, যাতে নিরাপদে প্রসব হতে পারে।

* গর্ভাবস্থায় কতকগুলি- রোগ তাড়াতাড়ি নির্ণয় ও চিকিৎসা করা। যেমন- হৃদযন্ত্রের রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তস্বল্পতা ও যক্ষা ইত্যাদি।

* গর্ভাবস্থায় জন্য কিছু জটিল সমস্যা তাড়াতাড়ি নির্ণয় ও প্রতিরোধ করা। যেমন- প্রি-এক্লাম্পসিয়া (এক ধরনের খিচুনী), প্লাসেন্টাপ্রিভিয়া (ফুলের অস্বাভাবিক অবস্থান), এক্সিডেন্টাল হেমোরেজ, মায়ের শ্রোনীর তুলনায় বড় শিশু ও জরায়ুর মধ্যে শিশুর অস্বাভাবিক অবস্থান, যা স্বাভাবিক প্রসবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

* গর্ভজনিত কারণে যে সমস্ত রোগীর বিপদের সম্ভাবনা বেশী, তা তাড়াতাড়ি নির্ণয় এবং নিরাপদে প্রসবের জন্য- উপযুক্ত স্থানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা।

* গর্ভবতী নারীকে খাদ্য, পুষ্টি, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি ও শিশুর যত্ন নেওয়ার বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা।

* প্রসূতির মানসিক অবস্থান উন্নতি করা যাতে প্রসবের সময় তার নিজের ওপর পরিপূর্ন আস্থা থাকে।

সুস্থ জীবনের জন্য ব্যায়াম

ব্যায়ম বা প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম করলে আমাদের শরীরের বিভিন্ন তন্ত্রের ক্রিয়া-কর্ম সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়, তাছাড়া বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের হাত থেকে শরীরকে মুক্ত রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের ফিজিক্যাল এক্টিভিটি অ্যান্ড হেলথ-এর সার্জন জেনারেলে রিপোর্ট অনুযায়ী নিয়মিত শরীর চর্চা করলে ঃ



* দীর্ঘজীবী হওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয় এবং সুস্থভাবে বাঁচা যায়।

* হৃদরোগের ঝুঁকি-বৃদ্ধি অথবা এ রোগের পূর্ব লক্ষণ দেখা দিলে তা রোধ করতে সহায়তা করে। তাছাড়া উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের উচ্চ মাত্রা রোধ করতে সক্ষম হয়।

* কোলোন ক্যান্সার ও ব্রেস্ট ক্যান্সারসহ বিশেষ ধরনের ক্যান্সার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে।

* টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

* বাত প্রতিরোধে সহায়তা করে। তাছাড়া বেদনা উপশম ও যাদের শরীরে অনমনীয় ভাব রয়েছে সেগুলো দূর করতে সাহায্য করে।

* হাড়ের ওজন হ্রাসের মত অনিষ্টকর ঘটনা বা অস্টেওপোরেসিস রোধ করতে সহায়তা করে।

* বয়স্ক ব্যক্তিদের বিভিন্ন ঝুঁকি কমায়।

* মানসিক অবসাদ ও উদ্বেগের লক্ষণ কমায় এবং মেজাজ ফিরিয়ে আনে।

* দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

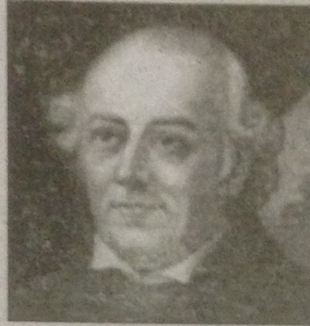
-- মুসলিমা ইয়াসমিন জুই
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ

ডিএইচ এম এস পরীক্ষা সম্পন্ন

সিমিলিয়া রিপোর্টার : ডিপ্লোমা ইন হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড সার্জারী (ডিএইচএমএস) কোর্সের ২০০৫-৬ শিক্ষা বর্ষের ১ম, ২য়, ৩য় ও সমাপনী বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল বোর্ডের অধীনে অনুমোদিত কেন্দ্রে দেশের ৩৬ টি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের প্রায় ১৫ হাজার ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহন করেন। ১৪ ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হয় এবং ২৪ ডিসেম্বর শেষ হয়। ২১ ডিসেম্বর হরতালের কারনে ঐদিনের পরীক্ষা ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রগুলোতে কিছুটা নকলের প্রবনতা লক্ষ্য করা গেলেও কোন ধরনের বড় অনিয়ম চোখে পড়েনি। ব্যবহারিক পরীক্ষা আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারী হবে বলে কোন কোন সূত্র বলছেন।

হাঙ্গেরীর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যালের অতীত বর্তমান

হানেমান আবিস্কৃত ও প্রচারিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে হাঙ্গেরী খুব দ্রুত গ্রহণ করেছিলো। প্রথম অর্গানন যা কি'না ১৮১০ সালে প্রকাশিত হয় তা খুব দ্রুত 'প্যাল বাগেট' এর নেতৃত্বাধীন এক দল চিকিৎসক ১৮৩০ সালে অনুবাদও প্রকাশ করেন। হাঙ্গেরীর রাজ প্রাসাদে জার্মান ভাষায় বহুল ব্যবহারই এই দ্রুততার কারণ। তারপরও স্থানীয় প্রশাসন ১৯১৯ সালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বন্ধ ঘোষণা করে।



বিজ্ঞানী হানেমান

'জোসেফ রাকোডি' রাকোডি; (১৭৯১-১৮৪৫) নামে বিখ্যাত একজন হাঙ্গেরিয়ান চিকিৎসক, ১৮৩১ সালে কলেরা মহামারীর চিকিৎসায় অসাধারণ সাফল্য পেয়েছিলেন আর্সেনিকাম ব্যবহারের মাধ্যমে, যা স্টেইনাম এনগার' ও "ফ্রাংক ফার্টার এ্যালজানাইন এনজিগার" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১ বছর পর। হাঙ্গেরীর রাজকীয় ব্যক্তিদ্বয় 'কোমুদ' ও সিলেলিন' বিখ্যাত হোমিও প্যাথিক চিকিৎসক "আলমাসি বালগ" এর সংস্পর্শে আসেন। ১৮২৫ সালে ডাঃ আলমাসি বালগ স্বশরীরে হানেমানের সহিত সাক্ষাত করে নিজেকে ধন্য করেন।

পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে হোমিওপ্যাথি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। ১৮৭০ সালে প্রফেসর "ফেরেনো হাসমান" (১৮১১-১৮৭৬) এবং প্রফেসর টিভাডোর রেকোর্ডি (১৮২৫-১৯১১) কে প্রধান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি 'চেয়ার' প্রবর্তনের বিষয়টি হাঙ্গেরীর পার্লামেন্টে পাস করা হয়। এই সময়ের মধ্যে দু'টি হাসপাতালও উদ্বোধন করা হয় বুদাপেস্টে। আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক লিগা মেডিকোরাম ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ১০ম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় বুদাপেস্টে। হাঙ্গেরীর হোমিওপ্যাথির ইতিহাস হাঙ্গেরীর রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে হোমিওপ্যাথির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সর্বশেষ এক নজিরবিহীন নিষেধাজ্ঞা শুরু হয় ১৯৪৯ সালে এবং শেষ হয় ১৯৯০ সালে। চিকিৎসক সম্প্রদায় এ সময়ে হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে অধ্যায়ন তো দূরের কথা এর নাম শোনা থেকেও বিরত থেকেছে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সমূহ, হাঙ্গেরী ভাষায় অনূদিত হোমিও প্যাথিক বইই শুধু তিরোহিত হয়নি, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে চিকিৎসক সম্প্রদায়ও নিজেদেরকে এই পেশা থেকে দূরে সরিয়ে ফেলেছিলো।

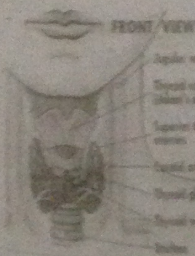
রাশিয়ার হোমিওপ্যাথিক মস্কো স্কুলের ৩ সপ্তাহের কোর্সের অনুসরণ করে ১১জন প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে ১৯৯১ সালে একটি নতুন কোর্স চালু করে হাঙ্গেরীর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল এসোসিয়েশন। এই এসোসিয়েশন ধারণা করে যে, এই সফলতা পূর্বপুরুষদের কৃতকার্যের ফল। ১৯৯৩ সালে "লিগা মেডিকোরাম" এই এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৯৩ সালের শেষ দিকে আমাদের এসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ৩ বছরের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং চালু হয়, প্রফেসর ডরসির সাহায্যে যিনি, ভিয়েনার হোমিওপ্যাথিক স্কুল, লণ্ডন কলেজ অব ক্লাসিক্যাল কলেজ অব হোমিওপ্যাথি এবং বাইরন ইনস্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

১৯৯৪ এর অক্টোবরে নতুন কোর্স চালু হয়। ফলস্বরূপ বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক শল্যচিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক এবং ভেষজবিদ হোমিওপ্যাথি শিক্ষা লাভ করে এবং আজ পর্যন্ত এ সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৫০ এ।

এসোসিয়েশনের নামে অক্টোবর ১৯৯৪ সালে সিমিলি' নামের একটি হোমিওপ্যাথিক জার্নাল প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয়। এটি বছরে চার বার বের হয়। এই এসোসিয়েশন হোমিওপ্যাথির গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমূহ হাঙ্গেরী ভাষায় অনুবাদ করাও শুরু করে। 'হোমিওপ্যাথিক সরকারী চিকিৎসার পাশাপাশি পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং এর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রশাসনের সহিত আলোচনা শুরু হয়েছে। যখন হোমিওপ্যাথির সামগ্রিক চিত্র সর্বজন গ্রাহ্য হবে তখন ইউরোপের এই সমাজ একে স্বীকৃতি দিবে বলে আশা করা যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের সদস্য সংখ্যা দুইশত ষাটজন।

মূল- ডাঃ ক্যাটেলিন কুটি
(প্রেসিডেন্ট, হাঙ্গেরীয়ান মেডিক্যাল হোমিওপ্যাথিক এসোসিয়েশন)
- অনুবাদঃ ডাঃ মোঃ শফিকুল আলম সিদ্দিকী, বিএইচ এম এস(ডিইউ),
সৌজন্যেঃ ইউরোপিয়ান জার্নাল অব ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি, সামার ১৯৯৬

থাইরয়েড ক্যান্সার নিজেই পরীক্ষা করুন



শুরুতেই থাইরয়েড ক্যান্সার নির্ণয় করতে পারা চিকিৎসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রতিমাসে অন্তত ১ বার নিম্নোক্ত পরীক্ষাটি নিজে নিজেই করুন।

উপকরণ : ১ গ্লাস পানি ও ১টি হাত আয়না।

পদ্ধতি : ১. প্রথমেই আয়নাটিকে সামনে ধরুন যাতে আপনার স্বরযন্ত্রের উঁচু অংশ (অ্যাডামস্অ্যাপেল) এবং ক্লাভিকলের (কলার বোন) মাঝের অংশটুকু পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়।

২. মনে রাখতে হবে যেন পরীক্ষার সময় আপনার মাথা সর্বোচ্চ ততটা উঁচু রাখতে হবে যতটা হলে আপনি আয়না না নাড়িয়ে এবং শ্বাসরোধ ছাড়াই পানি গিলতে পারেন।

৩. এবার এক চুমুক পানি নিন এবং গিলে ফেলুন।

৪. পানি গলাধঃকরণ করার সময় লক্ষ্য করুন আপনার অ্যাডামস্অ্যাপেল এবং কলারবোনের মাঝখানের অংশ ফুলে উঠে কিনা। যদি সন্দেহ হয়, বার বার পরীক্ষা করুন।

৫. নিশ্চিত হলে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মোঃ আসাদুজ্জামান জীবন
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

স্বেচ্ছায় রক্তদান করুন

মানুষের প্রয়োজনে মানুষ। মানুষের চলার পথে বিপদের শেষ নেই। মানুষের বিপদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উদ্বেগের বিষয় অসুস্থতা। অসুস্থ মানুষ সারাবার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু কিছু চেষ্টার সফলতা কিংবা বিফলতা নির্ভর করে জরুরীভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রাপ্তি। আমাদের অসুখের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জিনিষটির নাম রক্ত। দুর্ঘটনা জনিত অপারেশন কিংবা কিছু রোগ আছে যা সারাবার বা চিকিৎসা ব্যবস্থাই সারাজীবন রক্ত দিয়ে করতে হবে। তাৎক্ষনিকভাবে রক্তের প্রয়োজন মেটাতে না পারলে একটি জীবনের অকাল মৃত্যু অবধারিত। স্বজনের কিংবা প্রতিবেশীর এমন বিপদে আমাদের সকলেই এগিয়ে আসতে হবে। একটি জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজনে রক্ত দিতে হবে। রক্ত দানের মাধ্যমেই একটি জীবন ফিরে পেতে পারে স্বাভাবিক জীবন। এ মহৎ কাজটি আমরা যারা বিপদের সময় পাশে থাকি প্রথমে আমাদেরই করতে হবে। পরবর্তীতে অন্যকে বলতে হবে। বোঝাতে হবে, কার কখন বিপদ হবে কেউ জানেনা। তাই রক্ত দিয়ে অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতা খুবই প্রয়োজন। রক্ত দানে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না বরং উপকারিতাই বেশী। রক্তদান করার জন্য সব সময় মানবীয় মানসিকতা নিয়ে রক্তের বন্ধন একান্তই পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এমনকি বহির্বিশ্বের ও কর্তব্য। সকলের জন্য সকলে আমরা এ কাজে নির্ভীক হয়ে রক্তদান করি।

রক্তদানের যোগ্যতা ঃ রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলে ৬ মাসের মধ্যে কোন বড় অপারেশন না হলে, রক্ত বাহিত কোন জটিল রোগ না থাকলে, কোন বিশেষ ধরনের ঔষধ ব্যবহার না করলে এবং ৩ মাসের মধ্যে কোথাও রক্ত না দিলে ১৮-৬০ বছর বয়সী যে কোন সুস্থ পুরুষ/মহিলা রক্ত দিতে পারবে। তবে ইচ্ছা সাপেক্ষে পুরুষের ওজন ৪৭ কেজি এবং মহিলার ওজন ৪৫ কেজি হতে হবে।

রক্তদানের উপকারিতা ঃ সাধারণত আমাদের শরীরের রক্তকোষের আয়ু ১২০ দিন। আর এ ১২০ দিন পর রক্ত দিলে দেহে নতুন রক্তকনিকা সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। রক্তদানে দেহের কোন ক্ষতি হয় না বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া রক্তদান করলে অনেক রোগের ঝুঁকি কমে যায়। যেমন- হৃদরোগ, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি।

ইচ্ছা করলে সদস্য হতে পারেন- বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছায় রক্তদাতা সংগঠন আছে। এদের মধ্যে রেড ক্রিসেন্ট, সন্ধানী, বাঁধন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন অন্যতম। সন্ধানীর কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রত্যেকটি এলোপ্যাথিক মেডিকেল কলেজগুলোতে। বিশেষত, বাঁধন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিক ছাত্রদের প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা। এদের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি হচ্ছে। এ সমস্ত সংগঠনের সদস্য হতে পারেন। রক্ত দেওয়া এবং নেওয়া উভয় কাজটি সহজ হওয়ার বিশেষ সুযোগ। রক্তদানকে একটি সামাজিক আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত করুন। রক্ত দিন, জীবন বাঁচান। সব সময় মনে রাখতে হবে নিয়ম রক্তদানের মাধ্যমেই জীবন বাঁচাতে পারে। রক্ত দানের মাধ্যমে কারো জীবনের যেন বিপত্তি না ঘটে সেদিকেই খেয়াল রাখতে হবে।

ডাঃ আফরোজা নাহার (মুন্নী)

ডাঃ শমশের আলীর বলিষ্ঠ ভূমিকা

ইন্টার একাডেমী প্যানেলে বাংলাদেশের বিরল সম্মান

সিমিলিয়া ডেস্ক: গত ১ থেকে ৬ ডিসেম্বর মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় অনুষ্ঠিত ইন্টার একাডেমী প্যানেল অন ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুজের সাধারণ সম্মেলনে তীব্র প্রতিযোগীতার মধ্যে আই এ পি-এর এক্সিকিউটিভ কমিটিতে দ্বিতীয় বারের মতো সদস্যভুক্ত করে বাংলাদেশকে বিরল এ সম্মানে ভূষিত করা হয়। দেশের বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী, বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট, সুস্থ নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ ব্যক্তিত্ব, ইন্টার একাডেমী প্যানেলের সায়েন্স এডুকেশন ইভালুয়েশন গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. এম শমশের আলীর ওই সম্মেলনে বাংলাদেশ সহ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে আইএপির বিজ্ঞান শিক্ষার আওতায় আনার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকার বক্তব্য পেশ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল ১৪টি দেশের বিজ্ঞান একাডেমী পর্যায়ে আইএপির সাধারণ সদস্যভুক্ত হয়েছে।

আমি সাহিত্যের পুলিশ নই, তরুণদের বলি ঘাম ঝরাও, শ্রেষ্ঠ শ্রমটা দাও



-- চিনুয়া আচেবে

চিনুয়া আচেবের জন্ম পূর্ব-নাইজেরিয়ায় ১৯৩০ সালে। পাবলিক স্কুলে পড়া আচেবে ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। গ্রাজুয়েশন শেষে কাজ নেন নাইজেরিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন-এ শুরুতে রেডিও প্রযোজক ও শেষে বহিঃপ্রচার বিভাগের পরিচালক পদে। এ সময়টায় তাঁর লেখালেখি শুরু। আচেবে একজন লেখক, সহ- লেখক এবং সম্পাদক, সব মিলিয়ে সতেরটি বইয়ের প্রণেতা, এর মধ্যে পাঁচটি উপন্যাস- *Things fall Apart (1958), No Longer at Ease (1960), Arrow of God (1964), A Man of the people (1966) Ges Anthills of the savanali (1987)* রচনা সংগ্রহের মধ্যে *Morning yet on Creation Day and Hopes and impediments* এবং কাব্য সংকলন *Bevrare Soul Brother* উল্লেখযোগ্য। Okike পত্রিকার সম্পাদক আচেবে আফ্রিকান সাহিত্যের উপর প্রকাশিত হাইনম্যান সিরিজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, যার শিরোনাম সংখ্যা তিনশ' ছাড়িয়ে গেছে। আফ্রিকান সাহিত্যের জনক তার বহুল ব্যবহৃত বিশেষণ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রায় পঁচিশটি সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রিধারী এই লেখক বর্তমানে Bard College - এর ইংরেজি অধ্যাপক।

দুই কিস্তিতে নেয়া সাক্ষাৎকারটির প্রথম অংশ নেয়া হয় জানুয়ারির এক বৃষ্টি ভেজা ঠান্ডা সন্ধ্যায় *Unterberg* কবিতা কেন্দ্রে হল ভর্তি দর্শকদের সামনে। সেদিন ছিল মার্টিন লুথার কিংয়ের জন্মদিন, দর্শক-শ্রোতা মুখরিত হলরুমের স্টেজে দু'পাশে ফুলের তোড়া, মাঝে আচেবে অকপটে উত্তর দিয়ে গেলেন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর এবং একই সাথে দর্শকদেরও। গল্পবলার ঢঙে বললেন তার শৈশব আর যৌবনের কথা।

সাক্ষাতকারের বাকি অংশ গ্রহণ করা হয় শরতের শুরুতে তার নিউ ইয়র্কস্থ বাস ভবনে। হুইল চেয়ারে বসেই দরজা খুললেন, অভ্যর্থনা জানালেন আন্তরিক হাসিতে, বিশাল লিভিং রুমের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলে লম্বা এক আয়তকার ঘরে, এটিই তার পড়ার ঘর, দু'পাশে ইতিহাস, ধর্ম আর সাহিত্যের বিপুল বই, মাঝে তার লেখার টেবিল অল্প কিছু বই সেখানে ইতস্ত ত ছড়ানো।

নাইজেরিয়ার ঐতিহ্যবাহী পোশাকই আচেবের পছন্দ, যতোটা *Things fall Apart* -এর *Okonko* পরনে তারচে ঢের বেশি *Arrow of God* -এর পাদ্রির পোশাক। শান্ত মুখাবয়বের মাঝে জ্ঞানদীপ্ত দু'টি নাইজেরিয়ার প্রসঙ্গ এলে পাল্টে যান পুরোপুরি, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখ, মুহূর্তেই বনে যান একই সাথে আদি ও অভিজাত গল্প বলিয়ে।

১৯৯০-এ উদযাপিত হলো আচেবের ষষ্ঠতম জন্মদিন। নসুকাস্থ নাইজেরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে, তিনি যেখানে একজন ইংরেজি অধ্যাপক এবং ভূতপূর্ব বিভাগীয় সভাপতি, তার সহকর্মীগণ তার সম্মানে *Egle of Iroko* শিরোনামে একটি কনফারেন্সের আয়োজন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের আলোচকগণ আফ্রিকা ও বিশ্ব সাহিত্যে তাঁর অবদানের উপর বিশ্লেষণী বক্তব্য রাখেন। নেলসন মেন্ডেলা মুক্তি পাওয়ার দিনে কনফারেন্স উদ্বোধন করা হয় এবং এখন তা সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। সপ্তাহব্যাপী কনফারেন্সে পুরো পরিবেশটি ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ, গবেষণা পত্রপাঠ, ঐতিহ্যবাহী নাটক, এবং পার্টি ইত্যাদিতে মুখরিত। আফ্রিকার এ অঞ্চলে *Iroko* হচ্ছে দীর্ঘতম গাছ যার মগডালে ঈগলের আনাগোনা। এর অল্প কিছুদিন পর ডারমাউথের পুনরায় পড়ানোর উদ্দেশ্যে লাগোস এয়ারপোর্টের পথে তিনি এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। লন্ডন হাসপাতালের সফল অস্ত্রপচার শেষে বেশ কয়েক মাস তাকে সেখানেই কাটাতে হয় সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত যদিও হুইল চেয়ারেই তাকে চলাফেরা করতে হয় গত তিন বছরে তার স্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে, আত্মীয়-পরিজনকে বিস্ময়ে,রেখে দিব্যি তিনি নিজের যত্নআত্তি নিজেই করে চলেছেন। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন- জেরোমি ব্রুকস এবং ভাষান্তর করেছেন- আহমেদ শামীম

প্রশ্ন: আচেবে পরিবার সম্বন্ধে কিছু বলুন? Igbo গ্রামে আপনার বেড়ে ওঠা, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি। ঐ সময় এমন কিছু কি ঘটেছিল যা পরে আপনাকে লেখালেখিতে উদ্বুদ্ধ করেছে?

উত্তর: স্পষ্ট মনে পড়ছে, গল্পে আমার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, গল্প লিখতে নয়, শুনতে। ঘরে শোনা গল্প দিয়ে শুরু, প্রথমে মা পরে বোনের কাছে গল্প শুনি, গল্প শুনি বাবার কাছে বেড়াতে আসা তার বন্ধুবান্ধবের কাছে- কোনোটা পুরো কোনোটা টুকরো। যখন স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম-বইয়ের গল্পগুলো বেশ ভালো লাগলো। যদিও এই গল্পগুলো যেন কেমন, তবে আমার বেশ লাগতো। আমাদের অঞ্চলে আমার বাবা-মা প্রথম দিককার ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। তারা শুধু ধর্মান্তরিত নয়, বাবা ছিলেন একজন ঈভাজেলিস্ট-ধর্ম- শিক্ষক। তিনি আর মা ইগবোভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় পয়ত্রিশ বছর ধরে ধর্ম প্রচার করেছেন। আমি সম্ভবত তাদের পঞ্চম কি ষষ্ঠ সন্তান। আমি যখন সবে বড় হয়ে উঠছি, আমার বাবা অবসরে যান, আমাদের নিয়ে চলে আসেন তার পূর্ব পুরুষের গ্রামে।

স্কুলে যাওয়ার পর অন্যদের গল্প অন্য দেশের গল্প আমি পড়তে পাই। আমার এক রচনায় আমি লিখেছি কী কী জিনিসে আমার ব্যাপক আগ্রহ ছিল। উদ্ভট সব বিষয় এমনকি এক জাদুকরের গল্প, যে চীন দেশে গিয়েছিল প্রদীপ পাওয়ার আশায় ...... আমাকে, এসব আকৃষ্ট করতো কেননা এরা অনেক দূরের কিছু, অনেক দূরের যেন ইথারের। তারপর বড় হতে থাকি, পড়তে পাই রোমাঞ্চকর সব অভিযানের কাহিনী, কেন জানি না সেই সব গল্পে আমার ঐসব বুনোদের পক্ষ নেয়ার কথা ছিল যাদের অবস্থান ছিল মঙ্গলার্থে আগত শাদাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই আমি শাদাদের পক্ষ নিতাম। তারা অনেক সুন্দর, চমৎকার এবং তারা বুদ্ধিমান। কিন্তু অন্য পক্ষ তা নয় .... তারা নির্বোধ ও অসুন্দর। এর মাধ্যমেই আমি সেই ভয়ঙ্কর সত্যের সাথে নিজের গল্প না থাকার দৈন্যতার সাথে পরিচিত হই। প্রবাদ আছে, যতদিন না সিংহদের মাঝে কেউ ঐতিহাসিক হচ্ছে ততদিন শিকারের গল্প শিকারী মানুষটি গৌরবই বৃদ্ধি করবে। এই উপলব্ধি আমার অনেক দেরিতে আসে। এক সময় আমি অনুভব করি আমাকে লেখক হতে হবে। হতে হবে ঐতিহাসিক। এটা একজনের কাজ নয়। একার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এটা এমনই জিনিস যা আমাদের করতেই হবে, শিকারের গল্প যেন বেদনাকে প্রতিফলিত করে সাথে সাহস আর পরিশ্রমকে এবং তা এমনকি সিংহের।

প্রশ্ন: আপনি ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েটদের একজন। কেমন ছিল আপনার ক্যাম্পাস জীবন? কী পড়েছেন সেখানে? প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কি আপনার লেখালেখির কোনো ক্ষতি করেছে?

উত্তর: ইবাদান, মনে পড়ে, মহান এক শিক্ষাসদন। এটা স্ববিরোধী হলেও সত্যি নাইজেরিয়ায় উপনিবেশের এর এক অমর কীর্তি কেননা ইংরেজ উপনিবেশের শেষভাগে এর প্রতিষ্ঠা। তারা যদি ভালো কিছু করে থাকে তার মধ্যে এটা অন্যতম। এর শুরু লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কলেজ হিসেবে, কেননা ব্রিটিশ রাজত্বে কোনো উপনিবেশ সহজেই নিজস্ব একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে পারতো না, শুরুটা অন্যের উপাঙ্গ হিসেবেই করতে হতো, একটা বড় সময় তার অভিভাবকত্বেই কাটাতে হয়েছে। আমরা ছিলাম ইবাদান

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। ফলে আমি পেলাম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, সে সময় এরকমটাই হতো। স্বাধীনতার স্মারক, ইবাদান হলো একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। শুরু করেছিলাম বিজ্ঞান দিয়ে, তারপর ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস শেষে ধর্মতত্ত্ব। প্রত্যেকটি বিষয়ই চমৎকার এবং উপকারী। ধর্মতত্ত্ব পড়াটা আমার কাছে চমকপ্রদ ছিল। সম্পূর্ণ নতুন একটা বিষয় তার উপর এটা শুধুই খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বই ছিল না, পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য ধর্মও আমাকে পড়তে হয়েছিল। আমার শিক্ষক ড. পারিন্দার, বর্তমানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানসূচক অধ্যাপক। এ বিষয়ে ছিলেন অন্যতম বিজ্ঞজন। ডাহোমিতে তিনি এর উপর ব্যাপক গবেষণা করেছেন। প্রথম দিকে, আমি যখন তার পদ্ধতির সাথে পরিচিত হই, আমারটার সাথে মিলিয়ে দেখি, তুলনা করি কেমন যেন উন্মাদনাপূর্ণ উৎসাহ পাই। এই বিভাগে আরো একজন অধ্যাপকের সাথে আমার পরিচয় হয়। নাম জেমস ওয়েলচ, অসাধারণ এক লোক তিনি, একাধারে রাজা ষষ্ঠ জর্জ ও বিবিসি-এর ধর্মযাজক। অসাধারণ বক্তৃতা দিতেন। এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন **তোমাদের যা প্রয়োজন হয়তো আমরা তা শিখাতে পারবো না কিন্তু আমরা যতটুকু জানি তার সবটাই তোমাদের দিতে চেষ্টা করবো**। কী অদ্ভুত কথা, আসলে এটাইতো শিক্ষা এবং এই উত্তম শিক্ষাটাই আমরা পেয়েছিলাম, আমার প্রয়োজন এমন একটা জিনিসই আমি সেখানে শিখেছি আর সেটা হলো আচরণ। বাকি আমার নিজেকেই পাড় হতে হয়েছে। যেমনটা বলছি ইংরেজি বিভাগ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, সে সময় কেউ যদি জানতো কেউ একজন লেখক হবে বেশ হাসাহাসি হতো তাকে নিয়ে। এটা আলাদা করে তারা ভাবতে পারতো না। মনে পড়ে একবার আমাদের বিভাগে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো-লম্বা ছুটির উপর একটা গল্প লিখতে হবে বিভাগীয় পুরস্কারের জন্যে। আমি এর আগে কখনও গল্প লিখিনি, বাসায় ফিরলাম, ভাবলাম তাই বলে পারবো কেন। লিখলাম একটা গল্প, জমাও দিলাম। মাসের পর মাস চলে যায়; তারপর একদিন নোটিশবোর্ডে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। "কোনো গল্পই মানসম্মত না হওয়ায় কাউকে কোনো পুরস্কার দেয়া গেলো না। এই ঘোষণার নিচে আরো একটি কথাও লেখা ছিল। তাহলো, তারা আমার নামোল্লেখ করে লিখেছে এর গল্পটা উল্লেখযোগ্য। সে সময়কার ইবাদান এমন নয় যেমন আজ আপনার নস্যি হাতে নিয়ে নাচেন বরং সেটা ছিল পুরো শরীর দুলিয়ে নাচাই মতো। তাই ইবাদান বলেছে উল্লেখযোগ্য সেটাই বুঝতে হবে উচ্চ প্রশংসা। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমি আয়োজক প্রভাষিকাটির সাথে দেখা করি। আপনি বলেছেন আমার গল্পটি যথেষ্ট ভালো নয় তবে ইন্টারেস্টিং। বেশ, কিন্তু সমস্যাটা কোথায়? তিনি বললেন ফর্ম, বুঝলে ফর্ম যেন কেমন ত্রুটিপূর্ণ।' বললাম, একটু বুঝিয়ে বলবেন।' হ্যাঁ, বলব তবে আজ নয়, আজ আমি টেনিস খেলতে যাচ্ছি, পরে এক সময় বলবো, আমাকে মনে করিয়ে দিও।'

এভাবে পুরো এক টার্ম পার হয়ে যায়। যখনি তাকে জিজ্ঞেস করি তিনি বলেন, 'না-না এখন নয় পরে এক সময়।' তারপর একদিন সে নিজেই এসে আমাকে ডেকে বললেন,-দেখ আমি তোমার গল্পটা আবার পড়ে দেখলাম, আসলে এর মধ্যে কোনো ভুলই নেই।' ব্যাস সেখানেই শেষ-শুরু। ছোট গল্প লেখা সম্পর্কে আমার ইংরেজি বিভাগ থেকে ঐটুকুই শিখেছিলাম তারপর বাকি আমার নিজেকেই করতে হয়েছে।

প্রশ্ন : ঠিক কখন আপনি বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করেন, আপনার প্রথম চাকরি তো নাইজেরিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে তাই না?

উত্তর: অধ্যাপক ওলেচ আমাকে অনেক ব্রেক দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে স্কলার-শিপ পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি, তাই শেষে প্রচার মাধ্যমে যোগ দেই, কাজ শুরু করি একদল বিবিসির কর্মীদের সাথে। সেই থেকে শুরু। এই চাকরি আমার উদ্দেশ্য ছিল না। পাস করার পর কি করবো তার ঠিক ছিল না। ভেবে অবাক হই, এখনকার ছাত্ররা প্রথম থেকেই জানে তারা কী করবে। আমরা জানতাম না, শুধু পাস হবার চেষ্টা ছিল, জানতাম যে কিছু একটা হবেই, হতোও তাই। কেননা আমরা সংখ্যায় বেশি ছিলাম না, আজকে এমনটা ভেবে বাঁচা সম্ভব নয়। যাহোক কাজে ঢুকে দেখলাম আমার বিভাগ 'কথা বলার বিভাগ' বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ, যেন এটাই আমি চেয়েছিলাম, স্ক্রিপ্ট সম্পাদনা করা-মানুষের পাঠানো কথামালা। এর মধ্যে ছোটগল্পও থাকতো। আমি এদিকটায় বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলাম। সদ্য স্বাধীন দেশে সবকিছু কেমন ইতিবাচক এক পরিবর্তন হয়ে থাকলো, অল্পদিনেই আমার পদন্নোতি হলো ব্যবস্থাপক পদে।

প্রশ্ন: আপনার প্রথম দু'টি বইয়ের নাম- Things fall Apart এবং No Longer at Ease আধুনিক আইরিশ এবং আমেরিকান কবিদের কবিতা থেকে নেয়া, ইয়েটস- ইলিয়ট মনে হয়, আপানার প্রিয় দু'জন কবি।

উত্তর: প্রিয় ছিল অবশ্যই, সেটা অবশ্য মুল ব্যাপার নয়। আমি একটা ভিন্ন জিনিস দেখাতে চেয়েছি। তবে হ্যাঁ, ইয়েটস- ইলিয়ট মনে হয়, আপনার প্রিয় দু'জন কবি।

উত্তর: প্রিয় ছিল অবশ্যই, সেটা অবশ্য মুল ব্যাপার নয়। আমি একটা ভিন্ন জিনিস দেখাতে চেয়েছি। তবে হ্যাঁ, ইয়েটস আমার পছন্দ, ক্ষ্যাপা আইরিশম্যান। সত্যিই আমার তার প্রজ্জলতা। তার এলোমেলো আইডিয়াগুলো মনে হতো একজন কবির মাথায়ই মানায়। ভাবাবেগ! সব সময় ঠিক পথেই ছিল শেষ পর্যন্ত যদিও একগুয়ে মাথার লোক তবু তার হৃদয় সব সময় সঠিক পথেই পা রাখতো। তার কবিতা চমৎকার। আমার মধ্যেও কবিতা খেলতো এর জাদু আমাকে পেয়ে বসতো, যা মনে আসে তা-ই দিয়ে লাইনের পর লাইন সাজিয়ে যেতাম, যা কিছু ভালো লাগতো তা-ই দিয়ে। ইয়েটস এখানেই অনুভব করতাম সবচেয়ে বেশি। এর অনেক পড়ে তার চক্রতত্ত্ব বা সভ্যতার চক্র সম্পর্কে জানতে পারি। শিরোনামটা যখন নেই তখন এ সম্পর্কে তেমন চিন্তা ছিল না। Things fall Apart' কথাটাই কেমন যেন উপযুক্ত ও অপরিহার্য মনে হয়েছিল আমার কাছে। টি.এস এলিয়ট-এর কথা আলাদা। ইবাদান-এ সে পাঠ্য ছিল। পাদ্রী মুলত এক ঔজ্জল্য আছে তার মধ্যে একটা আলাদা টাইপ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তবে যে কবিতা থেকে নামটি (No Longer at Ease) নিয়েছি তা যিশুর জন্য নৈবদ্য নিয়ে আসা তিন জ্ঞানীদের (Magi) নিয়ে লেখা, ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম মহৎ কবিতা। তারা তিন জন দেশে ফিরে যাওয়ার পর আর কোনো শান্তি খুজে পাননি- (No Longer at Ease) অসাধারণ সারল্য তার ভাষায় যদিও বিষয়টা বেশ গভীর, খুবই তীক্ষ্ণ। তাই লাইনটা নাম হয়ে উঠেছিল। এর পরে কিন্তু কোনো বইয়ে এমনটা হয়নি।

প্রশ্ন: আপনার ইংলিশ প্রকাশক এলান হিলের কাছে শুনেছি Things fall Apart উপন্যাসের পণ্ডুলিপি পাঠানোর গল্পটা।

উত্তর: সে এক লম্বা গল্প। গল্পে প্রথম দিকে আছে কীভাবে পাণ্ডুলিপি প্রায় হারিয়েই ফেলেছিলাম। ১৯৫৭ সালে কয়েক মাসের জন্য BBC -তে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্যে লন্ডনে যাই স্কলারশিপের আওতায়। আমার সাথে উপন্যাসটির খসড়াটি নিয়েছিলাম শেষ করবো বলে। BBC-তে পৌছবার পর আমার এক বন্ধু, আমরা দু'জন এসেছিলাম নাইজেরিয়া থেকে, বলল, 'মিস্টার ফেলাসকে কেন তুমি তোমার লেখাটা দেখাচ্ছো না? গিলবার্ড ফেল্পস BBC স্কুলের একজন ইন্সট্রাকটর, একজন ঔপন্যাসিক। আমি বললাম, না না তা কেন?' এভাবে চলল কিছুদিন। কিন্তু শেষে এরকম চাপে পড়েই তার কাছে উপন্যাসের খসড়াটা নিয়ে গেলাম। সে বলল, বেশ.... ঠিক আছে' যেমনটা এখন কেউ আমার কাছে পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসলে বলি। তার মধ্যে কোনো রকম উচ্ছাস দেখা গেল না। কেনইবা হবে সে। ভদ্রতার সাথে সে পাণ্ডুলিপি নিয়ে চলে গেল। আমি ছাড়া সে-ই প্রথম ব্যক্তি যে এর সম্পর্কে বলেছিল, 'মানে এটা ইন্টারেস্টিং। বাস্তবে সে উপন্যাসটি পড়ে এতটাই নাড়া খেয়েছে যে এক শনিবার সে আমার খোজ করে। আমি তখন লন্ডনের বাইরে, সে আমার হোটেলের নাম্বারে ফোন করে কলব্যাক করার জন্যে মেসেজ রেখে দেয়। মেসেজ পেয়ে আমার মেঝেতে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, তার কী পছন্দ হয়নি, পছন্দ না হলে ফোন করে কলব্যাক করতে বলবে কেন? তাহলে তার পছন্দ হয়েছে। ব্যাপক উত্তেজনার মধ্যে আমি যখন আমি লন্ডন ফিরলাম তিনি বললেন, চমৎকার। তুমি কী চাও এটা আমার প্রকাশককে দেখাই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখনই না।' আমি তখন বললাম, কারন আমি মনে করি ফর্মটা এখনও নির্ভুল নয়। তিন পরিবারের একটা গাঁথা তৈরি করার কাজেই বেশি ব্যস্ত ছিলাম প্রথম খসড়ায়। তাই চিন্তা করলাম এর শরীরটা আরো টান টান করতে হবে। তাই ফেল্পসকে বললাম, আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, তবে আমি এটা নাইজেরিয়ায় নিয়ে যেতে চাচ্ছি, আরো কিছু সংশোধন দরকার। পরে অবশ্য আমি তা-ই করেছিলাম।

পরিবেশ ও জীবন

অধ্যাপক বি.এ. মনজুর হাসান (বুলবুল)

সমগ্র সৃষ্টির মাঝেই রয়েছে একটি সু-সমন্বিত পরিবেশ আর এই সু-সমন্বিত পরিবেশই সকল প্রকার জীবন সৃষ্টির প্রধানতম উৎস। কিন্তু পরিবেশকে যদি শুধু সৃষ্টি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়, তবে জীবের বংশগতিকেই শুধু মাত্র প্রাধান্য দেয়া হবে। কিন্তু বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ই বিশ্ব ভ্রমান্ডের সকল প্রকার জীব ও প্রাণীর জীবনের পূর্ণাঙ্গতার জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়। বিশ্বের সেরা সমাজ ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের মতে মাতৃগর্ভে সকল জীবের অবস্থান কালকে বংশগতিকাল হিসাবে বলা হয়েছে। আবার জীবনের বহিঃপ্রকাশের পক্রিয়াকে পরিবেশ প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে বিষয়টিকে যদি আরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে জীবের মাতৃগর্ভেই একটি স্বাধীন অন্ত ঃপরিবেশ রয়েছে যার সত্তার উপরও বর্হিঃপরিবেশের একটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সুনিশ্চিত রয়েছে যা না থাকলে সৃষ্ট জীবের বর্হিঃপরিবেশে পদার্পণ এবং অস্তিত্বের বিকাশ ঘটানো চূড়ান্তভাবে ব্যহত হতে বাধ্য। অন্যান্য জীবের ন্যায় মানব জীবনের বংশ গতিকে যেমন পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে, ঠিক তেমনি মানব শিশু পৃথিবীতে পদার্পণের সাথে সাথেই তার জীবনের বৃহত্তর পরিবেশের প্রভাব তার জৈবিক, দৈহিক, মানসিক বিকাশে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ পরিবেশের অস্তিত্ব একদিকে যেমন বংশগতির প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান, অন্যদিকে তেমনি পূর্ণাঙ্গ জীবনের প্রক্রিয়ায় ততধিক বিদ্যমান। অর্থাৎ বর্হিঃপরিবেশের ভূমিকা সীমাহীন এবং পরিবেশের এই সীমাহীন ভূমিকা পালন নিশ্চিত করে পরিবেশ মানব জীবনের কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন করে। পরিবেশ কর্তৃক মানব জীবনের এই কাঙ্খিত পরিবর্তন তার দৈহিক ও মানসিকভাবে ঘটে থাকে। পৃথিবীর মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী মহলও পরিবেশ ঘটিত এই কাঙ্খিত পরিবর্তনকে জানায় সুস্বাগতম।



কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে সৃষ্টির স্রষ্টার কাছে। মানুষ তখন এই সুন্দর পরিবেশটাকে এতই আপন মনে করে যে, তখন সে বুঝতে পারে শুধু বংশগতি নিয়ে জন্মগ্রহণই পরবর্তী জীবনের বা জীবনচক্রের প্রয়োজন মিটানোর জন্য চূড়ান্ত প্রাপ্তি নয়, বরং সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশগত একটি নিশ্চিত নিরাপত্তার বিধান মন্ডিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া পৃথিবীর পরিবেশ ফুলে ফলে সুশোভিত 'ও শান্তিপূর্ণ হলে মানব ও অন্যান্য প্রাণী জগতের জন্য সুন্দর পরিবেশ একটি আকর্ষণীয় প্রাপ্তি। হয়ত সেই কাঙ্খিত একটি পরিবেশ কবি গুরু রবি ঠাকুরের দৃষ্টি ও অনুভূতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর সে কারণেই তিনি বলেছিলেন- "মরিতে চাহিনা এই সুন্দর ভূবনে"। তিনি যে পরিবেশের কথা দিয়ে তার কবিতার ছন্দ অলংকৃত করে ছিলেন, তাঁর সেই কথাটি আজও প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের ভাষা হয়ে আছে। কিন্তু যে সুন্দর পরিবেশকে উপলক্ষ করে তিনি যুগযুগান্তর বেঁচে থাকার আকাঙ্খা ব্যক্ত করে ছিলেন, আজও কি সেই পরিবেশ আছে? না তা নেই। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটেছে আজ।

বিশেষ করে মানবজাতি শুধুমাত্র বংশগতির সৃষ্ট রক্ত মাংসের জীব ছাড়া আজ আর কিছুই নয়। সামাজিক সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবে মানবজাতির মাঝে সামাজিক ও মানবিক গুনাবলীর বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়েছে। কারণ জীব জন্মের পর থেকে বিরাজমান যে অস্বাস্থ্যকর, অসুস্থ, অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে যেভাবে অবস্থান করতে হচ্ছে, তা শুধু বাংলাদেশ নয় বরং সারা বিশ্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। মানুষ তথা সমগ্র প্রাণী জগতের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে সৃষ্টিকর্তা যে সম্পদ উপহার দিয়েছেন, তা মানুষ দ্বারাই অপব্যবহারের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সকল পরিবেশ সৃষ্টি জগতের বায়োটিক ও অ্যা-বায়োটিক অর্গানিজমকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। অ্যা-বায়োটিক যেমনঃ প্রধানত বাতাস, পানি, মাটি ও অন্যান্য উপাদান যা মানুষ সহ সকল প্রাণী জগতের জন্য অপরিহার্য। বায়োটিক যেমনঃ মানুষ, জীব, প্রাণী, পশু-পাখি ইত্যাদি যাদের অস্তিত্বের জন্য অ্যা-বায়োটিক উপাদান সমৃদ্ধ পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়োজন।

সুতরাং পরিবেশের অন্তর্গত এই দুটো উপাদানের উৎসই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পরিবেশ জগতের এই মূল্যবান ও জীবন সৃষ্টি ও রক্ষাকারী উপাদানগুলোর উপর নানাভাবে মানুষ কর্তৃক ব্যাপক ক্ষতি সাধনমূলক আচরণ করা হচ্ছে। মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এমনভাবে ক্ষতি সাধন করছে যে, প্রতিনিয়তই মানুষ সহ প্রাণী জগত রোগাক্রান্ত হয়ে ও পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে কিংবা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নিরক্ষরতা, শিক্ষাহীনতা, অসচেতনতা ও অজ্ঞতার কারণে বায়োটিক এবং অ্যা-বায়োটিক অর্গানিজম ও তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় ভারসাম্যহীনতা দেখা দিচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় শুধু বাংলাদেশ কেন গোটা বিশ্বেই

পরিবেশের কথা



পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিবে এবং প্রাণীজগত ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানে অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক সার, কীট নাশক, শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ, গাড়ীর ধোঁয়া, ব্যাপক ধূমপান, প্রচণ্ড শব্দ, অস্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃপ্রণালী ব্যবহার জীবন রক্ষাকারী উপাদান সমূহ যেমনঃ পানি, মাটি এবং বাতাস দুষিত ও বিষাক্ত করছে। এভাবে সৃষ্ট দুষিত পরিবেশ আজ মানব জাতি সহ সকল জীব জগতের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা যদি নিয়ন্ত্রিত না, আগামী প্রজন্মও এভাবে ধ্বংস হতে থাকবে। আর এর জন্য মানব সমাজই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী।

তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আমাদের বর্তমান মানব সম্পদ- গোষ্টি জন্মের পর থেকেই এ ধরনের একটি দূষিত পরিবেশে অবস্থান করে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অথচ সকল উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে একটি সুরক্ষিত, সুসমন্বিত ও জীবন রক্ষাকারী পরিবেশ যা মানুষের জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কার্যকরী ভাবে গতিশীল থাকা ও রাখাও আমাদের কর্তব্য। আমাদের দেশে পরিবেশ নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক কাজের উদ্যোগ অবশ্যই আশা ব্যাঞ্জক। কিন্তু সময়ের দাবীতে প্রয়োজনের তুলনায় উদ্যোগগুলো অসমন্বিত এবং অপ্রতুল। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো পরিবেশ বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রকৃত পক্ষে পরিবেশের অংশ বিশেষ। তার কারণ যখনই পরিবেশ উন্নয়নের কাজ করা হয়, দু' একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তা করা হয়। কিন্তু পরিবেশ বলতে আমাদের যা বুঝা উচিৎ তা হচ্ছে 'জীব জগতের চারিদিকে বেষ্ঠিত সকল বিষয়ের একটি সমন্বিত অবস্থা'। সুতরাং এই সমন্বিত অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তার সাথে আরও প্রয়োজন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রচার, সচেতনতা বৃদ্ধি, সুষ্ঠ পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ। আমরা পরিবেশের অংশ বিশেষকে পূর্ণাঙ্গ পরিবেশ বলে মনে করি বলেই পরিবেশের সবগুলো বিষয়ের অবস্থা অসমন্বিত থেকে যায়। ঠিক একই কারণে সবগুলো প্রচেষ্টাও অসমাপ্ত থেকে যায়। আবারও বলতে হয় যে, আমাদের বুঝতে হবে পরিবেশ বলতে জীবনের সকল পর্যায়ে সকল অবস্থানকে বুঝা উচিত। যদি তাই হয়, তবে পরিবেশ উন্নয়ন বলতে বুঝতে হবে যে পরিবেশের সকল উপাদানের একটি সমন্বিত উন্নয়ন। অতএব খণ্ড খণ্ড ভাবে ও খণ্ডকালীন ভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন না করে পরিবেশের প্রতিটি উপাদান যেমনঃ মানুষ, অন্যান্য জীব/প্রাণী, প্রাকৃতিক সম্পদ এসবের উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা প্রয়োজন এবং প্রাণী জগতের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনুকূল পরিবেশের সমন্বিত রূপদান করা উচিত। এক্ষেত্রে বলতে হয় যে, দেশের আইন-কানুন এর সঠিক প্রয়োগ এবং বাস্তবতার নিরিক্ষ্যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের সমস্যার সমাধান করা ও মানবিক চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হওয়ার বিষয়টি একই সাথে বিবেচ্য হলে অর্থাৎ সমন্বয় করে করা হলে অবশ্যই সার্বিক পরিবেশ উন্নত হবে। প্রধানত এদেশের শিশু ও নারীরাই পরিবেশ দূষনে অধিকতর আক্রান্ত কারণ অ্যা-বায়োটিক পরিবেশ দূষনের ফলে তাদের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক বিকাশ মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয় এবং এভাবে মানব সম্পদ পঙ্গু মানব সম্পদে পরিণত হয়। দেশের প্রাণী জগত ও মানব গোষ্ঠি সুস্থ্য স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুস্থ্য পরিবেশে জীবন যাপন করতে সক্ষম হোক এটাই সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুস্থ্য পরিবেশে দৈহিক, নৈতিক, মানষিক গঠন ও সুস্থ্য পরিবেশে জীবন যাপন করা প্রতিটি মানুষের নাগরিক ও মানবিক অধিকার। তবে নাগরিক কর্তব্য পালনের দিকটি নির্দিষ্ট করে এই অধিকার নিশ্চিত এ করার দায়িত্ব দেশের সরকার ও জনগণের এবং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সু-সম্পন্ন করা সম্ভব। মানব সন্তানের জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপে অর্থাৎ মাতৃগর্ভ পরিবেশ থেকে পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ মানব সম্পদের বৈশিষ্ট্য সমূহের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটায়। এই জীবন চক্রেই দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, চারিত্রিক ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে। যার উপর পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে।

আগামী দিনগুলোতে আমরা একটি কাঙ্খিত সুস্থ্য পরিবেশ নিশ্চিত করে, মানব সম্পদকে ধ্বংসাত্মক পরিবেশ থেকে মুক্ত করে সুন্দর পরিবেশে দেখতে চাই। এই চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে শুধুমাত্র তখনই সমন্বয় করা সম্ভব হবে যখন দেশের নীতি নির্ধারণকারীগণ, আইন প্রনয়ণ ও প্রয়োগকারীগণ, সুশিল সমাজ, সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেবা প্রদানে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহ সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নমূলক নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারবেন। সুতরাং সকলকে কাজে এগিয়ে আসতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে যে, বংশগতি নিয়ে শুধু জন্মগ্রহণই নয় বরং মানুষ সহ সকল প্রাণী জগতের প্রয়োজনের নিরিক্ষে সুন্দর পরিবেশ বেষ্ঠিত জীবনও কাম্য। প্রকৃত মানব ও জীব/প্রাণী সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশের কোন বিকল্প নেই। সকলের সহযোগিতায় আগামী দিনগুলোতে আমরা আমাদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও সুস্থ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবো যেখানে থাকবে না প্রাকৃতিক পরিবেশর ভারসাম্যহীনতা ও মানবিক পরিবেশের অবক্ষয়। শুধু থাকবে একটি সমন্বিত ও উন্নত সুশৃঙ্খল পরিবেশ যা মানব তথা প্রাকৃতিক সম্পদের কল্যাণে নিবেদিত একটি কাঙ্খিত পরিবেশ।

বাংলাদেশ কৃষি শিল্পে মাশরুম চাষ

মাশরুম এক ধরনের নিম্ন শ্রেণীর মৃত পরজীবি, এক কোষী/হ্যাপ্লয়েড বা সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ এবং ছত্রাক শ্রেণীর মধ্যে উচু স্তরের এক প্রকার ফাঙ্গাসের ফুলই মাশরুম। যা খাদ্য ও ঔষধ হিসেবে সকল প্রকার প্রাণী ও জীব ব্যবহার করতে পারে। মাশরুম চাষ করা খুব সহজ। আধুনিক উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনে জীবাণুমুক্ত কম্পোস্ট ব্যবহার করে অতি মাত্রায় উৎপন্ন সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি সংক্ষিপ্ত এবং বাণিজ্যিকভাবে অপরিহার্য। মাশরুম সম্পূর্ণ হালাল খাদ্য হিসেবে পবিত্র আল-কোরআনে সূরা বাকারার ৫৬-৮০ আয়াতের মধ্যে 'মান্না সালওয়া' নামে উল্লেখ রয়েছে। মাশরুমের আরবী নাম কামৃআ।

মাশরুমের পরিচয় ঃ মাশরুম আর ব্যাঙের ছাতা এক জিনিস নয়। ব্যাঙের ছাতা প্রাকৃতিকভাবে যত্রতত্র গজিয়ে উঠা বিষাক্ত ছত্রাক। কিন্তু মাশরুম বিষাক্ত নয়। মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিকর ও ঔষধীগুণ সম্পন্ন সম্পূর্ণ হালাল সবজি। মাশরুম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উদ্ভাবিত বীজ দ্বারা পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত পরিবেশে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ ছাড়াই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা একটি সবজি। ইহা জাতিসংঘের খাদ্য সংস্থা (FAO) অনুমোদিত খাদ্য।

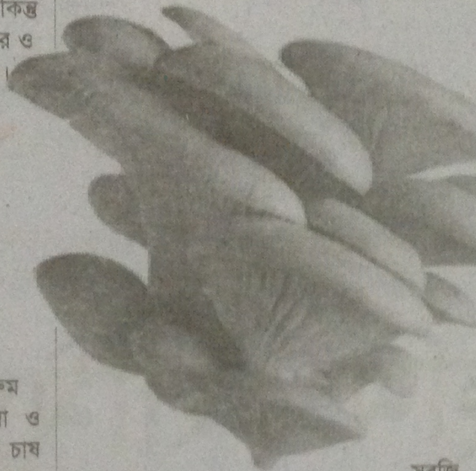
মাশরুমের প্রকারভেদ ঃ বিশ্বে প্রায় ৩৫-৪০ হাজার প্রজাতির মাশরুম রয়েছে। এদের মধ্যে ২০০ প্রজাতির মাশরুম খাওয়ার যোগ্য এবং ২০ প্রজাতির মাশরুম চাষ করা সম্ভব। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুযায়ী মাত্র ৭ প্রজাতির মাশরুম চাষ করা যায়। চাষযোগ্য মাশরুমের নাম এবং প্রতীক বর্ণনা করা হলো।

ঝিনুক মাশরুম, দুধ ছাতু মাশরুম, খড় মাশরুম, শিতাকে মাশরুম, ঋষি মাশরুম, বাটন মাশরুম এবং কান মাশরুম। মাশরুম বিভিন্ন রং-এর হতে পারে। সাধারণ তাপমাত্রায় সাদা, শীতে বেগুনী, গোলাপী, শেপ-কলিকা, খয়েরী, লাল ও বাদামী।

উৎপাদনে মাশরুমের অবস্থান ঃ উৎপাদনে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমেই মাশরুম চাষ শুরু হয়। নানাবিধ কারণে বাংলাদেশে মাশরুম চাষ প্রচলন আশানুরূপ সম্প্রসারিত হয়নি। কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় কৃষি ফসল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষত ব্যাপক অপুষ্টি ও জনপ্রতি সবজির সীমাবদ্ধ প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ করা অত্যন্ত জরুরী। তদুপরি বিশ্বব্যাপী মাশরুমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাশরুম রফতানি করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ৫০ লাখ মে. টন মাশরুম উৎপাদিত হয়। উৎপাদনের দিক থেকে চিন শীর্ষে। নিম্নে একটি সারণীতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মাশরুম উৎপাদনকারী দেশসমূহের বাৎসরিক গড় উৎপাদন তুলে ধরা হলো।

চীন ৭ লক্ষ মে. টন, যুক্তরাষ্ট্র ৩ লক্ষ মে. টন, জাপান ৩ লক্ষ মে. টন, নেদারল্যান্ড ২ লক্ষ মে. টন, যুক্তরাজ্য ২ লক্ষ মে. টন, ইন্দোনেশিয়া ৬০ হাজার মে. টন, ভিয়েতনাম ৫০ হাজার মে. টন, মালয়েশিয়া ৪০ হাজার মে. টন এবং ভারত ৩০ হাজার মে. টন। বাংলাদেশে এখনো মাশরুম উৎপাদনে কোন পরিমাপ পাওয়া যায়নি।

মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা ঃ একজন সুস্থ লোকের জন্য প্রতিদিন ২০০-২৫০ গ্রাম সবজি খাওয়া প্রয়োজন। কারণ সবজিতে পাওয়া যায় দেহকে সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় উপাদান ভিটামিন ও মিনারেল। উন্নত দেশের লোকেরা প্রতিদিন গড়ে ৪০০-৫০০ গ্রাম সবজি খান। অথচ আমরা প্রতিদিন গড়ে ৪০-৫০ গ্রাম (আলু বাদে) সবজি খাচ্ছি। প্রয়োজন ও প্রাপ্তির এই ব্যবধানের কারণে আমাদের শতকরা ৮৭% পুষ্টিহীনতা জনিত রোগে ভোগেন। এ অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে পুষ্টিকর সবজি খাওয়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে। আর অধিক পরিমাণ সবজি খেতে হলে অধিক পরিমাণ সবজি উৎপাদন করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচলিত ২টি পদ্ধতি। এক. আবাদী জমি বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সমান্তরাল পদ্ধতি এবং দুই. প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আমাদের দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক সেই হারে সবজি উৎপাদনের উপযোগী জায়গা কমছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমি কমে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দেশে ভূমিহীনের সংখ্যা প্রায় ৫০ ভাগ, যাদের শুধু ঘরই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি বা সমান্তরাল পদ্ধতিটি এদেশের জন্য অচল।



তাহলে শুধুমাত্র উলম্বিক পদ্ধতি আমাদের সমস্যার সমাধান দিতে পারে। কিন্তু এ পদ্ধতির জন্যও নূন্যতম আবাদী জমির দরকার হয়। অথচ দেশের ৫০% লোকের সেই সুবিধাটুকুও নেই। তাই আমাদের এখন এমন কোন সবজি বা উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার যা চাষীরা তাদের ঘরকে ব্যবহার করতে পারেন। আর তা কেবল মাশরুম চাষের মাধ্যমেই সম্ভব। অপরদিকে, বাংলাদেশের জলবায়ু ও আবহাওয়া মাশরুম চাষের অত্যন্ত উপযোগী। মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ অত্যন্ত সস্তা এবং সহজলভ্য (খড়, কাঠের গুড়া, আখের ছোবড়া, পঁচা পাতা প্রভৃতি)

মাশরুম চাষের সুবিধা ঃ (১) মাশরুম চাষে আবাদী জমি দরকার হয় না (২) ঘরের মধ্যে চাষ করা যায় (৩) তাকে তাকে সাজিয়ে একটি ঘরকে কয়েকটি ঘরের সমান ব্যবহার করা যায় (৪) অত্যন্ত অল্প সময়ে অর্থ্যাৎ মাত্র ৭-১০ দিনের মধ্যে মাশরুম পাওয়া যায় যা বিশ্বের অন্য কোন ফসলের প্রযোজ্য নয় (৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না।

সবজি হিসাবে মাশরুমের ব্যবহার ঃ তাজা (Fresh) ও শুকনো (সংরক্ষিত) মাশরুম সবজি হিসাবে নানা প্রকার সুস্বাদু খাবার রান্না করে খাওয়া যায়। চাষ করা প্রজাতিগুলির সবগুলিই ভোজ্য। কিন্তু বনভূমি কিংবা অকর্ষিত পড়ো জায়গায় যে সব প্রজাতির মাশরুম পাওয়া যায় তাদের কোন কোনটি ভোজ্য মাশরুম নয়। যেগুলি ভোজ্য প্রজাতির নয় তা কিন্তু বিষাক্ত। ভুলবশত খেলে বিষক্রিয়া হবে। অতএব, বন্য প্রজাতিকে ভোজ্য বস্তু হিসাবে ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই চিনতে হবে। তবে এমন বিশ্বাস ছিল যে রান্নার পর বিষাক্ত মাশরুম চেনা যায়। রুপোর চামচের সংস্পর্শে এলে সঙ্গে সঙ্গে তার বর্ণ পালটে যাবে। কিন্তু এ ধারনা ভিত্তিহীন বলে প্রমানিত হয়েছে। যারা মাশরুমের সঙ্গে পরিচিত নয় তারা স্বভাবতই বুঝতে পারেন না কিভাবে বস্তুটিকে খাওয়ার মত করে তুলতে হবে।

মাশরুমের পুষ্টি গুণ ঃ প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুম/পাউডার মাশরুমের পুষ্টিমান। প্রোটিন ২৫%-৩৫%, ভিটামিন ও খনিজ ৫৭%-৬০%, ফ্যাট ৪%-৬%, কার্বোহাইড্রেট ৫%-৬% মাশরুমের প্রোটিন নির্দোষ এবং অত্যন্ত উন্নত মানসম্মত। একটি ভালো মানসম্মত প্রোটিনের পূর্বশত হলো অত্যাবশকীয় ৯টি এমাইনো এসিড, আর মাশরুমে অপরিহার্য ৯টি এমাইনো এসিডই প্রশংসনীয় মাত্রায় আছে। মাশরুমের প্রোটিনের বিপরীতে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের সর্বনিম্ন উপস্থিতির কারণে কোলেস্টরল মুক্ত থাকা যায় তাই মাশরুমের প্রোটিন নির্দোষ।

-- মোঃ শহীদউল্লাহ্
ওয়েফ, ২৫ জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা-১২০৩

DEEP-LAID

হোমিও, ইউনানী এবং হারবাল ডিভিশনের

পক্ষ থেকে

মাসিক সিমিলয়া পত্রিকাকে শুভেচ্ছা

একবিংশ শতাব্দীর

বাংলাদেশে

হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও হার্বাল ওষুধ শিল্পকে আধুনিকরণে

আরও একধাপ এগিয়ে চলছে ....

ডীপলেড ফার্মাকো লিঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক নির্ধারিত GMP মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ডীপলেড একটি যুগান্তকারী হোমিও ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি আজ একটি বিশ্বমানের হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও হার্বাল ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন স্বীকৃত।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়



DEEP-LAID PHARMACO LIMITED

53/1, Kaptan Bazar (1st Fl.), Wari, Dhaka-1203

Phone : 7125551, 7125931, E-mail: deeplaid@dhaka.net

Editor : Dr.Sheikh Farid Ahammod, 25 Joykali Mondir Road, Wari, Dhaka-1203, Ph : 01712667896